SOCIAL HISTORY OF THE BENGALI CUISINE FROM BENGALI COOKING BOOKS, LITERATURE AND OTHER WRITINGS

Biswajit Panda

29-08-2018

File No. CCRT/SF-3/143/2015

Senior Fellowship for 2013-2014, Field: Literature, Sub-field: Bengali

Address: D-8/15, Karunamayee Housing Estate, Salt Lake, Kolkata 700 091

E-mail: biswajitpanda400@gmail.com

Phone: 09674884063

বাঙালির খাদ্য-সংস্কৃতির সামাজিক ইতিহাস

বিশ্বজিৎ পণ্ডা

১৯৩১-এ আবিষ্কৃত হয় শিলালিপিটি। বড়ু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় গ্রামে। মৌর্যযুগের খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। সেখানে বলা আছে, সংবঙ্গীয়দের গ্রামে দুর্ভিক্ষের জন্য, রাজার আদেশ এসেছে মহামাত্রের মাধ্যমে পুণ্ড্রনগরের রাজপুরুষের কাছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতদের আপৎকালীন অবস্থার ভিত্তিতে সাহায্য পৌঁছে দাও। জোগান দাও তিল, সর্ষে, ধান আর কিছু অর্থ।

এই হল বাংলার প্রথম লিখিত ইতিহাস। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, খাদ্যদ্রব্য হিসেবে তিল, সর্ষে আর ধানের প্রচলন ছিল ব্যাপকভাবে; আজ থেকে দু হাজার তিনশ বছর আগে। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ভাত, ধান থেকে উৎপন্ন, তা বাংলায় আসে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে। গোলাম মুরশিদ তাঁর *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬) বইতে জানাচ্ছেন, 'চীন ও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জায়গায় ধান চাষ হতো শুকনো মাটিতে। ভারতবর্ষেই সম্ভবত পানিতে ডোবানো জমিতে প্রথম ধানের চাষ হয়। এ ধরনের চাষ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার বিশেষ অনুকূল ছিলো। সে কারণেই কালে-কালে ভাত বাঙালিদের প্রধান খাবারে পরিণত হয়' কালিদাসের *রঘুবংশ* কাব্যের রঘু বঙ্গদেশে এসেছিল, সেখানেও ধান চাষের উল্লেখ আছে।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত-এ উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জাতের উৎকৃষ্ট ধান চাষের উল্লেখ আছে। নীহাররঞ্জন রায় *বাঙালীর ইতিহাস* (দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩)-এ প্রাচীন বাংলায় যে সরষের চাষ হত, তার উল্লেখ করেছেন। এর ব্যবহার দু'রকমের। এক, মশলা হিসেবে। দুই, রান্নার তেল হিসেবে। বৈদিক সাহিত্যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে, চরক সংহিতায় সরষের তেলের উল্লেখ আছে।

বিশ্বজিৎ পণ্ডা
27-08-2018

এছাড়া, মঙ্গলকাব্যেও সরষের তেল দিয়ে রান্নার বহু পদের বিবরণ আছে। দ্বিজ বংশীদাস (ষোড়শ শতাব্দী)-এর *মনসামঙ্গল* কাব্যে আছে:

নিরামিষ রান্ধে সব ঘৃতে সম্ভারিয়া।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে তৈল-পাক দিয়া॥

'তৈল-পাক' বলতে এখানে সরষের তেলের রান্নার কথাই বলা হচ্ছে। মাছের রান্না বাঙালিরা কখনোই সরষের তেল ছাড়া করে না। বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গল* (পঞ্চদশ শতক)-এ আছে:

সাজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ।

এখানে সরষের তেলকে 'কটু তৈল' বলা হচ্ছে। এছাড়া, সরষের তেলে নানা আয়ুর্বেদিক ব্যবহারও বাঙালিদের মধ্যে আবহমান কাল ধরে প্রচলিত। যেহেতু বাঙালির খাদ্যতালিকায় মাছের একটি পদ অপরিহার্য, এই কারণে সরষের তেলের ব্যবহারও ব্যাপক। অবশ্য, আধুনিক বাঙালিরা এর ব্যবহার কমিয়ে আনছেন ডাক্তারের পরামর্শে।

আর তিলের ব্যবহার ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাপক প্রচলন ছিল। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ দেখতে পাচ্ছি, 'তিল' থেকে 'তৈল' কথাটি এসেছে। সেখান থেকে 'তেল'। হরপ্পাতেও পোড়া তিল পাওয়া গিয়েছিল। অথর্ববেদে তিলের উল্লেখ আছে। পিনাকী ভট্টাচার্যের লেখা 'খানাতল্লাশি' কলামে (১৯ জুলাই ২০১৫) পাচ্ছি, 'সেই জমানায় আর্যদের আর তার কিছুদিন পরে পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের লাঞ্চ হত ভাত, ঘি, দুধ আর তিল দিয়ে।' চিন্তাহরণ চক্রবর্তী *হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান* বইতে তিল বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, 'পবিত্র ও মাঙ্গলিক পঞ্চশস্যের অন্যতম। নানাভাবে তিলের ব্যবহারের কথা শাস্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে। তিল বাটা গায়ে মাখা, তিল জলে স্নান করা, তিলের দ্বারা হোম করা, তিল দান করা, তিল খাওয়া, তিল বপন করা — তিলের দ্বারা এই ছয় রকম কাজ করা প্রশস্ত। ইহার নাম ষট্‌তিলাচরণ — যিনি ইহা করেন, তিনি ষট্‌তিলী। জন্মতিথিতে ও মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। জন্মতিথিতে তিল, গুড় ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পান করিবার নিয়ম আছে। দেবকার্য ও পিতৃকার্যে তিল ও তুলসীর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আদ্যশ্রাদ্ধের মুখ্য অঙ্গ তিলকাঞ্চন দান বা সোনার

সহিত তিল দান। সধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে তিল ব্যবহার নিষিদ্ধ। তিলের পরিবর্তে তাঁহারা যব ও ধান ব্যবহার করিয়া থাকেন।' নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস-এ লিখছেন, 'মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত বাঙলা সাহিত্যে বাঙালীর আহার্য ও পানীয় সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় এবং তাহার মধ্যে রুচি ও রসনার যে সূক্ষ্ম বোধ সুস্পষ্ট, রন্ধনকলার যে সূক্ষ্ম ও জটিল পরিচয় বিদ্যমান, আদিপর্বের সংক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে কোথাও সে-পরিচয় ধরা পড়ে নাই।'

এই সূক্ষ্মতার একটি প্রাচীন উদাহরণ *প্রাকৃত পৈঙ্গল* গ্রন্থে আছে (সম্ভবত, চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি)।

ওগ্গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সযুক্তা
মওইলি মচ্ছা নালিত্ গচ্ছা দিচ্ছই কান্তা খা(ই) পুনবন্তা।

অর্থাৎ, কলকাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল, নালিতা (পাট) শাক যে স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করেন তাঁর স্বামী পুণ্যবান।

দশম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে রচিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের একটি ছবি পাওয়া যায়। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, 'বাঙলার সুবিস্তৃত স্মৃতি-সাহিত্য, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, চর্যানীতিমালা, দোহাকোষ, সদুক্তিকরণামৃত-ধৃত কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শ্লোক, প্রাকৃত পৈঙ্গলের কিছু কিছু শ্লোক, রামচরিত ও পবনদূতের মতন কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থে।'

এছাড়া, শ্রীহর্ষ (একাদশ শতাব্দী) রচিত *নৈষধচরিত* মহাকাব্যে বাঙালি-খাদ্যাভ্যাসের বিস্তৃত বিবরণ পাই। ভৌগোলিক কারণেই বঙ্গদেশ নদীমাতৃক, এখানে মাছ সহজলভ্য। তাই মাছ-ভাতই বঙালির প্রধান খাদ্য। তবে সুকুমার সেনের মতে, প্রাচীন বাঙালি সমাজে মাছ-মাংস জনপ্রিয় ছিল ব্রাহ্মণ নয়, অব্রাহ্মণদের মধ্যে। তবে বাঙালি স্মৃতিশাস্ত্রকার ভবদেব ভট্ট (দশম-একাদশ শতাব্দী) বাঙালিদের মাছ-মাংস খাওয়ার পক্ষেই যুক্তি দিয়েছেন। আরেক স্মৃতিশাস্ত্রকার জীমূতবাহন ইলিশ মাছ ও ইলিশ মাছের তেলের কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকে প্রমাণ হয়,

29-08-18

ইলিশ মাছ প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালিদের প্রিয় ছিল। এছাড়া, বাংলার অন্যতম স্মৃতিশাস্ত্রকার শ্রীনাথাচার্য মাছ-মাংস খাওয়ার পক্ষে বলেছেন।

পুরো এই পর্বে কিন্তু ডালের উল্লেখ নেই। ডালের প্রথম উল্লেখ পাচ্ছি মঙ্গকাব্যে। বস্তুত, খাবারের বিস্তৃত বিবরণ ও পাক-প্রণালী মঙ্গলকাব্যেই পাওয়া যাচ্ছে। বাঙালির প্রিয় মাছ-ভাত-শাকের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ডাল, আর রান্নাবান্নার বৈচিত্রময়তাও মুগ্ধ করার মতো।

মঙ্গলকাব্যের কথা বললে প্রথমেই আসে বহুকাল ধরে জনপ্রিয় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (জন্ম আনুমানিক ১৫৪৭, মৃত্যু জানা যায় না)-র *চণ্ডীমঙ্গল কাব্য*-র কথা। এখানে দেখছি, ডাল একটি জনপ্রিয় খাদ্য। দরিদ্র কালকেতু জাউ আর ডাল খেয়ে পেট ভরাচ্ছে। এই পর্বে ফুটকলাই, মুসুর, মাস, মুগ, ছোলার ডালেই উল্লেখ পাই। *মঙ্গলকাব্য*-এ খাদ্যাভ্যাসের বিস্তৃত বিবরণ মূল বইতে থাকবে। অর্থাৎ সাধারণ বাঙালি খাদ্যতালিকায় ডাল যুক্ত হয়ে দাঁড়াল: শাক-ভাত-ডাল-মাছ। প্রাচীন বাংলায় সবজি বলতে ছিল: বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁকরোল, কচু ইত্যাদি। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এই তরকারি 'আদি অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক ভাষাভাষীর দান।' ... 'পরবর্তী কালে, বিশেষভাবে মধ্যযুগে, পর্তুগীজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানাসূত্রে নানা তরকারী, যেমন আলু আমাদের খাদ্যের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে।'

চণ্ডীমঙ্গল ছাড়াও বিজয় গুপ্ত (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী)-র *মনসামঙ্গল*, ঘনরাম চক্রবর্তী (১৬৬৯-?)-র *ধর্মমঙ্গল*, ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০)-এর *অন্নদামঙ্গল*-এ বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ (আনুমানিক ১৫৩০-১৬১৫)-এর *চৈতন্যচরিতামৃত* কাব্যে, বড়ু চণ্ডীদাস (সম্ভবত, চতুর্দশ শতাব্দী)-এর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ আছে বাঙালি গৃহস্থের নিত্যদিনের পরিতৃপ্ত আহার-অভ্যাসের কথা। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ রাধা রাঁধছেন নিমঝোল, শাক, পটলভাজা, অম্বল। এছাড়া, মধ্যযুগের সাহিত্য, লোকসাহিত্য, ছড়া, গানেও অঞ্চলভেদে একটা বিবরণ পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাস (১৩৯৯/১৪৩৩-?)-এর *রামায়ণ*-এও বাঙালি খাবার-দাবারের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে।

ময়মনসিংহ গীতিকা-য় 'কাজল রেখা'-র পিঠে তৈরির বিবরণ আছে:

29-08-18

নানা জাতি পিঠে করা গন্ধে আমোদিত।

চন্দ্রপুলি করে কন্যা চন্দ্রের আকিরত॥

চই পপরি পোয়া সুরস রসাল।

তা দিয়া সাজাইল কন্যা সুবর্ণের থাল॥

ক্ষীর পুলি করে কন্যা ক্ষীরেতে ভরিয়া।

রসাল করিল তায় চিনির ভাজ দিয়া॥

এই পিঠে-পুলি বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের একটি প্রধান বিশেষত্ব। এছাড়াও, *ময়মনসিংহ গীতিকা*-য় আরো বহু আমিষ-নিরামিষ রান্নার বিবরণ আছে। আরেক লোকসাহিত্য আশুতোষ চৌধুরী সংগৃহীত *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*। এখানেও সাধারণ গৃহস্থের রান্নার বিবরণ:

হাঁসর আন্ডা রাইন্ধে ডালা নুন মরিচে কড়া।

পরুণ দিয়া তেল্‌ত ঝুনি বানাই লইছে বড়া॥

লৈটা মাছের ঝোল আর মোরগের গোছ।

খাইয়া দাইয়া মালেকের মন হইল খোস॥

এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। যে অঞ্চলে, যা সহজলভ্য, সেটা দিয়েই গুছিয়ে রান্নাবান্না হত। তবে অভাব-অনটনের সময়ে এই ব্যঞ্জন-বিলাসের রাশ টানা হত। গোপীচাঁদের গান থেকে উদাহরণ দিয়ে এই মত দিয়েছেন অধ্যাপক কুণাল চক্রবর্তী, ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৯, *দেশ* পত্রিকার একটি প্রবন্ধে।

তবে 'গোপীচাঁদের গান' আমি এখনও সংগ্রহ করতে পারিনি।

খনার বচনের ভাষা বাংলাই।

ভারতকোষ-এ পাচ্ছি, এর বয়স চারশ বছরের কাছাকাছি। চাষবাস ও খাবার-দাবার নিয়ে গ্রামবাংলায় এখনও প্রচলিত আছে।

গ্রামবাংলায় 'ডাকের বচন' বলেও এক খাবারদাবার নিয়ে প্রচুর ছড়া চালু আছে।

এই ডাক হচ্ছেন 'গোপজাতীয় জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি, যাঁর অনেক উক্তি খনার বচনের মতো প্রবাদে পরিণত।' (*সংসদ লেখা অভিধান*, ৫ম সংস্করণ, ২০০০)।

কোন ঋতুতে কী খেতে হবে, ডাকের বচনে পাই:

১। কার্তিকে ওল, মার্গে বেল,
পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল।
জ্যৈষ্ঠে ঘোল, আষাঢ়ে দই,
শ্রাবণে চূড়ান্ত খই
ভাদ্রে তাল, আশ্বিনে শশা
ডাক বলে এই বারোমাসা॥

২। চৈতে গিম তিতা
বৈশাগে নালিতা মিঠা।
জ্যৈষ্ঠে অমৃত ফল
আষাঢ়ে খই, শাওনে দই
ভাদরে তালের পিঠা
আশিনে শশা মিঠা।
কার্তিকে খইলসার ঝোল
আগুনে ওল।
পুষে কাঞ্জি, মাঘে তেল
ফাল্গুনে পাকা বেল।

29-08-18

এই দুই বচন পেয়েছি মিলন দত্তর *বাঙালি খাদ্যকোষ* (দে'জ় পাবলিশিং, ২০১৫) থেকে। অরুণ নাগ তাঁর *চিত্রিত পদ্মে* (সুবর্ণরেখা, ১৯৯৯) বইতে লিখেছেন, 'ছাপাযন্ত্রের অনুপস্থিতি ও ব্যাপক নিরক্ষরতার যুগে সাধারণ মানুষ কেমন করে প্রণালী মনে রাখতো? অন্তত একটি উপায় ছিল প্রবাদ-প্রবচনে অমর করে রাখা। প্রবচনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অন্য তাৎপর্য, অপরিবর্তনীয় আদর্শ হিসাবে গৃহীত হওয়া।' উদাহরণ হিসেবে, ময়মনসিংহের আঞ্চলিক রন্ধন-প্রণালীবিষয়ক *ডাকের বচন*-এর উল্লেখ করেছেন:

নিমপাতা কাসন্দির ঝোল। তেলের উপর দিয়া তোল।
পলতা শাক রুহি মাছ। বলে ডাক ব্যঞ্জন সাঁচ॥
মদগুর মৎস্য দায়ে কাটিয়া। হিং আদা লবণ দিয়া।
তেল হলদি তাহাতে দিব। বলে ডাক ব্যঞ্জন খাব॥
পোনামাছ জামিরের রসে। কাসন্দি দিয়া যেজন পরসে।
তাহা খাইলে অরুচ্য পালাএ। আছক মানবের কথা দেবের
লোভ যাএ॥
ইচিলা মাছ তৈলে ভাজিয়া। পাতি লেবু তাহাতে দিয়া।
যাহাতে দেই তাহাতে মেলে। হিং মরিচ দেই ঝোলে॥
চালু দিহ যত তত। পানি দিহ তিন তত।
ভাত উৎলাইলে দিহ কাটী। তবে জ্বালে ভাটি॥
বড় ইচিলা দায়ে কুটি। হিং দিয়া তৈলে ভাজি।
উলটি পালটি দেহ পিঠ। ইহা কাইলে যোজন দিঠ্॥
পোড়া মাছ লবণ প্রচুর। আর ব্যঞ্জন পেলাহ দূর।
পাকা তেতলি বৃদ্ধ বোয়াল। অধিক করিয়া দিহ জ্বাল।
কাটি দিয়া করিহ ঝোল। খাবার বেলা মাথা নাহি তোল॥

২৭-০৪-১৪

দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৭৩-১৯৪৩) লিখিত *পল্লী বৈচিত্র্য*-এ (১৯০৫) বা লোকাচারের বৈচিত্র্যময় বিবরণ। সেখানে শীতলা-ষষ্ঠী অর্থাৎ শ্রীপঞ্চমীর পরদিন অরন্ধনের দিন সাধারণ গ্রামবাসীদের খাবার-দাবারের বিবরণ এরকম:

> রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া অরন্ধনের পান্তভাত খাইতে আরম্ভ করিল। আজ পান্তভাতের উপকরণও অদ্ভুত; - পান্তভাতের সঙ্গে তৈল, লবণ ও কাঁচালঙ্কা বিরাজিত ও আস্ত কলাই-সিদ্ধ, লম্বা লম্বা আল্‌তাপাতি শিম-সিদ্ধ, 'সলে' বেগুন-সিদ্ধ, 'বেথোর' পাতা ও কুল-সিদ্ধ আজ পান্তভাতের সঙ্গে খাইবার ব্যবস্থা। কেহ কেহ ইহাই যথেষ্ট নয় মনে করিয়া ডাল ও মাছের অম্বল রাঁধিয়া রাখে — কিন্তু সকলে নহে।

সরস্বতী পূজার পরদিন অরন্ধনে 'গোটাসেদ্ধ' নামে এই প্রথা এখনো চালু আছে দু-বাংলায়।

আর এই পান্ত বা পান্তার মধ্যযুগ থেকেই উল্লেক পাচ্ছি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ-এ দেখছি, তিনি অনুমান করছেন, পানিভাত থেকে এর উৎপত্তি।

গোপীচন্দ্র, চণ্ডীমঙ্গল, ক্ষেমানন্দ দাসের *মনসার ভাসান,* বিজয় গুপ্তের *মনসামঙ্গল* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পান্তার উল্লেখ দেখিয়েছেন। বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পান্তা খাওয়াটা জড়িয়ে আছে। এই কারণে বাংলাদেশে ইলিশ মাছ ভাজা আর পান্তা খাওয়ার চল হয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে। দরিদ্র বাঙালির আহার সেই জাতির চিহ্ন হয়ে উঠছে, এই হল একটা চমৎকার উদাহরণ।

১২০৪-০৫ নাগাদ তুর্কি খলজি হানাদার বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণসেনের অন্যতম রাজধানী বিদ্যুৎগতিতে নবদ্বীপ দখল করে। মধ্যাহ্নভোজ অসমাপ্ত রেখে লক্ষ্মণসেন পালিয়ে যান। তারপর মুসলমান শাসকদের অধীনে বাংলা শত শত বছর থেকেছে, কিন্তু বাঙালির রান্নাঘরে তাদের প্রবেশ করতে সময় লেগেছে। বাংলা ভাষায় বহু আরবি-ফারসি শব্দ এসেছে, মূলত সরকারি ভাষার কারণে। তারপর পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসি, ইংরেজরা এসেছে। একই ভাবে

বহু শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকে গেছে যেমন, তেমনি খাবারের কিছু উদাহরণ এবং খাদ্যাভ্যাসেও তার প্রভাব পড়েছে। তবে তা ধীরে ধীরে।

মুসলমানি খাবারের প্রভাব বাংলায়, বিশেষত, কলকাতায় পড়েছে লখনৌয়ের নবাব ওয়াজ়িদ আলি শাহ (১৮২২-১৮৮৭) কলকাতায় আসার পর ১৮৫৬ সালে। আর ১৯05 সালে খোলা হল চিৎপুরে খুলল 'রয়্যাল' রেস্টোরেন্ট। লখনৌ ঘরানার মোগলাই খাবারদাবারের দোকান। বিদেশিদের খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করতে বাঙালিরা খুবই বাছবিচার করেছে। অবশ্য অপ্রতিরোধ্য ব্যতিক্রম আলুর ক্ষেত্রে। আলু এখন প্রাধান খাদ্যের একটা উপাদান। এর কারণ, এখানকার মাটিতে ভালো আলুচাষ হয় এবং বেশ অর্থকরী। আবার, মুসলমান শাসকদের আনা তরমুজ, পর্তুগিজ়দের আনারস, আতা, নোনা, কাজুবাদাম ইত্যাদি আজ বাঙালির নিজস্ব হয়ে উঠেছে।

নানা ধরনের মিষ্টান্ন বাঙালির খাবারের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসে অন্যান্য খাবারদাবারসহ প্রাচীনযুগের নানা মিষ্টান্নর বিবরণ আছে। মণ্ডা-মিঠাই-দুধ-ঘি-মিষ্টান্ন-পায়েস বাঙালি বড়লোকদের নিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের তালিকায় তাকলেও, বাঙালি বাড়ির উৎসব-অনুষ্ঠানে সাধ্যানুসারে এর দেখা মিলত।

সবার ওপরে, বাঙালি আবহমান কাল ধরে শুধু অন্নজলই প্রার্থনা করে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) *পরিত্রাণ*-এ লিখেছিলেন, 'মহাদেব বুকের মধ্যে রেখেছেন অন্নপূর্ণাকে, আর মাথার উপর রেখেছেন গঙ্গাকে — কাউকেই তাঁর ছাড়লে একদণ্ড চলে না — তাঁর প্রাণের অন্নজল দুই-ই সমান চাই।'

পর্তুগিজ় নাবিকদের নেতা ভাসকো দা গামা তাঁর দলবল নিয়ে ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছলেন ১৪৯৮, ২০ মে। সঙ্গে এনেছিলেন চারটি জাহাজ আর তিনজন দোভাষী। তখন ইয়োরোপীয় বাজারে ভারতের মরিচ আর রেশমের বিপুল চাহিদা। দামও ছিল আকাশছোঁয়া। এতটাই যে মরিচকে বলা হত 'কালো সোনা'। ভারত থেকে কিনে আরব বণিকরা পৌঁছত

শিঞ্জিনী গুপ্ত
২৭-০৪-১৮

ইয়োরোপীয় বাজারে। তারা চড়া দামে বেচত, প্রচুর লাভও করত। ইয়োরোপীয়রা এই কারণে সরাসরি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতে চেষ্টা করছিল। কলম্বাস পথ ভুল করেছিলেন, ভাসকো দা গামা করেননি।

ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে ভারতের এই যোগাযোগ পরবর্তীকালে ভারতের ইতিহাস বদলে দেবে। পর্তুগিজ়রা বাংলায় ব্যবসা করার সনদ পেয়েছিল গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহের আমল (১৫৩৩-১৫৩৮)-এ। তারপরে পর পর সনদ পেয়েছিল ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসি, ইংরেজরা। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল পর্তুগিজ় আর ইংরেজরা। দাস-ব্যবসার মতো কুকীর্তি যেমন অনেক আছে পর্তুগিজ়দের, অবদানও কম নয়। গোলাম মুরশিদ *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (২০০৬)-তে লিখেছেন, 'ঘটনাচক্রে ভাসকো সঙ্গে এনেছিলেন আধুনিকতার একটা মস্ত হাতিয়ার — একটা ছাপাখানা। আরও পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ বণিকরাও ব্যবসা করে রাতারাতি "নবাব" হওয়ার উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের পণ্যের সঙ্গে বাইপ্রোডাক্টের মতো ইউরোপীয় শিক্ষা এবং চিন্তাধারাও অনুপ্রবেশ করেছিল বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে।' এই পর্তুগিজ়দের মাধ্যমে ভারতে অনেক নতুন খাদ্যবস্তুও এসেছিল। যেগুলো পরে ভারতে, বাংলায় প্রধান খাদ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। যেমন লঙ্কা, আলু পাঁউরুটি; এছাড়া আনারস, পেয়ারা, পেঁপে, কাজুবাদাম, কফি, সাগু, আতা, বাঁধাকপি ইত্যাদি। মিলন দত্তর *বাঙালির খাদ্যকোষ* (২০১৫)-এ আলু সম্পর্কে জানাচ্ছেন, 'জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকার পেরু। সেখান থেকে ১৬শ শতকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩০ সাল নাগাদ দেরাদুন পাহাড়ের ঢালে আলুর চাষ শুরু হয়। ভারতে প্রথম ব্রিটিশরা, তার পরে মুসলমানরা আলু খেতে শুরু করে। হিন্দুরা আলু খেয়েছে অনেক পরে।'

আর, ষোড়শ শতকে তারা এনেছিল তামাক। ধীরে ধীরে সমস্ত ধর্ম-জাতিনির্বিশেষে তামাক খাওয়া বাড়তে থাকে। নানা পদ্ধতিতে। ধনী-দরিদ্র সব ধরনের মানুষের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা এতটাই ছিল যে অষ্টাদশ শতকে তামাকের মহিমা কীর্তন করে বাংলায় একাধিক কাব্যও লেখা হয়।

২৫-০৪-১৪

প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে বাংলার শাসক ছিল মুসলমানরা। ইংরেজ বণিকদের কাছে ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজৌদ্দল্লার পরাজয়ের পর বাংলার ইতিহাসে যুগান্তর ঘটে। ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, বাংলার সিংহাসনে প্রায় দশ বছর পুতুল নবাব বসিয়ে ধীরে ধীরে বাংলা শাসন করতে থাকে। তারপর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সনদ নিয়ে, একই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও জুলুম করে প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ও শুরু করে। এরপর তো ১৮৫৭-এ কঠোর ভাবে 'সিপাহি বিদ্রোহ' দমন করে তারা ভারতের শাসক হয়ে ওঠে। অন্যান্য ইয়োরোপীয় বাণিজ্যিকদের তারা তার আগে থেকেই হঠাতে শুরু করে।

এই ইংরেজ শাসনকাল থেকে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের কিছু পরিবর্তন আসে। এর একটা প্রধান কারণ, তাদের মূল কেন্দ্র ছিল কলকাতা। যদিও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) লিখেছিলেন, 'ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল।' ঔপনিবেশিক অভিঘাতে, বাঙালি পরিবারের ভেতরের দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও সে-পরিবর্তন আটকানো যায়নি। স্টু, চপ, কাটলেট, টমেটো, বরফ, সোডার বোতল, বিলাতি মদ, চ, বিস্কুট— এসব ইংরেজদেরই অবদান। মিলন দত্তর *বাঙালির খাদ্যকোষ*-এ আছে, 'ব্রিটিশদের সূত্রে এ দেশে এসে যে খাবারগুলো প্রায় দেশি খাবারে পরিণত হয়েছে, বিস্কুট নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। ১৮৪৭ সালে প্রথম ব্রিটিশরা এ দেশে বিস্কুট আমদানি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সেই আমদানি বছরে প্রায় ২০০০ টনে পৌঁছেছিল। ১৮৮৫ সাল নাগাদ ভারতীয় প্রস্তুতকারকরা বিস্কুট তৈরি শুরু করে। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এ দেশে বিভিন্ন রকমের প্রায় ১০ হাজার টন বিস্কুট তৈরি হত।'

এই বিস্কুট সম্পর্কে রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রবল আপত্তি ছিল। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে তরুণরা এই রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এর একটা বিবরণ আছে রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)-র *সেকাল আর একাল* (১৮৭৪)-এ। তিনি এই বইতে লিখছেন, 'তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদের এমনি সংস্কার হইয়াছিল যে মদ খাওয়া ও খানা খাওয়া সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কোসংস্কারের উপর জয়লাভ করা। কেহ কেহ উদ্ধতবেশে দোকানদারের

সিদ্ধার্থ ... ২৭-০৮-১৮

নিকটে গিয়া বলিতেন, "গোরু খেতে পারিস্? গোরু খেতে পারিস্?" এইরূপে প্রচলিত রীতিনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা মহা-আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন। একবার তাঁহাদের মন্ত্রণা হইল, মুসলমানের দোকানের বিস্কুট খেতে হবে। কয়েকদিন মন্ত্রণাই হয়, কাজে কেহ অগ্রসর হইতে পারেন না। একদিন, অদ্য এই কার্য্য সমাধা করিতেই হইবে, এইরূপ স্থিতপ্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানের দোকানের সম্মুখে আইলেন, কিন্তু তাহার ভিতর প্রবেশ না করিয়া পথের উপরে সকলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এগিয়ে গিয়ে বিস্কুট কিনিয়া লইয়া আইসেন, তাহা কাহারও সাহস হয় না। শেষে একজন অপেক্ষাকৃত অধিক সাহসী পুরুষ এগুলেন। কিন্তু তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল। আস্তে আস্তে দোকানের ভিতরে গিয়া বিস্কুট নিয়ে যেমন তিনি বেরুলেন, অমনি তাঁহার সঙ্গিগণ তিনবার গগনভেদী স্বরে "Hip! Hip! Hurrah!" বলিয়া উঠিলেন। তাঁহারা এই কাজকে কুসংস্কারের উপর অসামান্য জয় মনে করিয়া এইরূপ করিয়াছিলেন।'

যদিও রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), *একেই কি বলে সভ্যতা* প্রহসনে ইংরজ-শিক্ষিত তরুণদের অন্ধ অনুকরণকে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

তাদের মুসলমানদের হাতে খাওয়া, জাতিভেদ না-মানা, ছোঁয়াছুঁঠি না-বিচা করা, নিচু জাতের লোকদের সঙ্গে একপাতে না-খাওয়া, গরু-মাংস, নবাবি খানা, মদ্যপান, বিস্কুট ইত্যাদি 'নিষিদ্ধ' খাবার খাওয়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। এজন্য তাদের পাড়াছাড়া করা বা ত্যাজ্যপুত্র করার মতো ঘটনাও ঘটেছিল।

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-র লেখা *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ* (১৯১১)-এ স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) সম্পর্কে আছে, 'শিষ্য গোঁড়া হিন্দু; অখাদ্য দূরে থাকুক, কাহারও স্পৃষ্ট দ্রব্য পর্যন্ত খায় না। এজন্য স্বামীজী শিষ্যকে কখনো কখনো 'ভট্চায' বলিয়া ডাকিতেন। প্রাতর্জলযোগ সময়ে বিলাতি বিস্কুটাদি খাইতে খাইতে স্বামীজী সদানন্দ স্বামীকে বলিলেন, "ভট্চাযকে ধরে নিয়ে আয় তো।" আদেশ শুনিয়া শিষ্য নিকটে উপস্থিত হইলে স্বামীজী ঐ সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ তাহাকে প্রসাদরূপে খাইতে দিলেন। শিষ্য দ্বিধা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিল দেখিয়া স্বামীজী

29-08-18

তাহাকে বলিলেন, "আজ কি খেলি জানিস? এগুলি মুর্গির ডিমের তৈরি!" উত্তরে সে বলিল, "যাহাই থাকুক, আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। আপনার প্রসাদরূপ অমৃত, খাইয়া অমর হইলাম।" শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, "আজ থেকে তোর জাত, বর্ণ, আভিজাত্য, পাপ, পুণ্যাদি অভিমান জন্মের মতো দূর হোক— আমি আশীর্বাদ করছি।"

ওই বইতেই আছে, স্বামীজী বলছেন, "'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না' করে ছুঁৎমার্গীর দল দেশটাকে ঝালাপালা করেছে।"

সন্ন্যাসী হয়েও স্বামী বিবেকানন্দ খাদ্যবিচারে খুবই বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি খেতে ভালোবাসতেন, সব ধরনের খাবারই খেতেন, রান্না করতেন, এক জায়গায় তিনি শিষ্যকে বলছেন, 'যে ভাল রাঁধতে পারে না, সে ভাল সাধু হতে পারে না— মন শুদ্ধ না হলে ভাল সুস্বাদু রান্না হয় না।'

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ-এ আছে, 'স্বামিজী ইংরেজী ধরনে রাঁধিবেন বলোয়া কতকটা মাছ নিজে চাহিয়া লইলেন।' শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখছেন, 'স্বামীজীর বামহস্তে শালপাতার ঠোঙায় চানাচুর ভাজা। বালকের মতো উহা খাইতে খাইতে তিনি আনন্দে পথে অগ্রসর হইতেছেন।' শিষ্যর সঙ্গে দেখা হতেই তাঁকে চানাচুর দিয়ে বললেন, 'চারটি চামাচুর ভাজা খা না? বেশ নুন আর ঝাল আছে।'

বাজারে আসা এই নতুন খাদ্য নিয়ে আবার কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭৬) *হুতোম প্যাঁচার নক্সা* (১৮৬২)-য় ব্যঙ্গ করে লিখছেন, 'রঙ্গভূমির গেট হতে রামলীলার রণক্ষেত্র পর্যন্ত দু সারি দোকান বসেছে, মধ্যে মধ্যে নাগরদোলা ঘুচ্চে — গোলাবী খিলি, খেলনা, চনেচুর ও চীনের বাদাম প্রভৃতি ফিরিওয়ালাদের চীৎকার উঠ্‌ছে।' এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ চা-পানও করতেন। এই চা-ও ইংরেজদের আমদানি। গোলাম মুরশিদ *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*-তে জানাচ্ছেন, লন্ডনে প্রথম চায়ের দোকান খোলা হয়। ১৬৫৭-এ, সে-সময় ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে চা-বিস্কুট জনপ্রিয় পানীয় ছিল। 'চা' চিনা শব্দ। বাংলার সঙ্গে চিনের যোগাযোগ সেই আদি যুগ থেকে। অথচ ঔপনিবেশিক কালের আগে কোথাও চা-পানের উল্লেখ নেই।

29-08-18

ভারতকোষ (১৯৬৭)-এর তৃতীয় খণ্ডে আছে, 'চীন হইতে ইংল্যাণ্ডে চা রপ্তানি হইত। ইহাতে অসুবিধা হওয়ায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ উদ্ভিদবিদ জোসেফ ব্যাঙ্ককে ভারতে চা চাষের সমস্যা অনুধাবন করিতে বলিলে তিনি ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে উত্তর-পূর্ব ভারত চা চাষের অনুকূল বলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সামের কমিশনার ডেভিড স্কট আসামে চা পাওয়া যায় বলেন এবং শিবসাগরের বীসা গাউম (Gaum)-এর নিকট মেজর ব্রুস ও তাঁহার ভ্রাতা কর্তৃক সংগৃহীত চায়ের নমুনা কলকাতায় পাঠান। উহা 'চা' বলিয়া স্বীকৃত হইলেও বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন জেন্‌লিন্‌স চা উত্তর আসামের সম্পদ বলিয়া আন্দোলন করেন। এই সময় লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতে চা প্রচলনের জন্য একটি কমিটি স্থাপিত করেন (১৮৩৪ খ্রী) ও চীন হইতে বীজ ও উপযুক্ত লোক আনার ব্যবস্থা করেন। এই কমিটি জেন্‌কিন্‌সের কথামত অনুসন্ধান করিয়া আসাম প্রদেশ চা চাসের উপযুক্ত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে (১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বন্ধ হয়) এই প্রচেষ্টার ফলে ১ পাউণ্ড চা বিলাতে চালান যায়। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে আসাম কোম্পানি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাগানগুলির ভার লইবার জন্য গঠিত হয় ও আজও এই কোম্পানি আছে। এইভাবে ভারতে চা-শিল্পের পত্তন হয়।'

চায়ের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য বাংলায় ইরেজরা বহু চেষ্টা করেছে। হাটে-বাজারে বিনামূল্যে চা খাইয়ে, চায়ের প্যাকেট দিত তারা। চায়ের যে অনেক ভালো ভালো গুণ আছে— একথা প্রচার করত, প্রচুর বিজ্ঞাপন দিত চায়ের প্রচারের জন্য। এর ফলও পেয়েছিল হাতেনাতে। গরম পানীয় হিসেবে দ্রুত এর চল শুরু হয়েছিল। আবার 'চা-পানের বিলাসিতা'-র বিরুদ্ধে প্রতিরোধও তৈরি হয়েছিল বাঙালি সমাজে। অন্যান্য লেখক, পত্রপত্রিকা ছাড়াও বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) চা-পানের বিরোধী ছিলেন। 'চা-এর প্রচার ও দেশের সর্বনাশ' নামে *দেশ* (৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫) পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে চা-পন্থীদের তুলোধোনা করেছিলেন। লেখাটির শুরুই হয়েছিল এইভাব: এক শতাব্দী পূর্বে মেকলে আমাদের লক্ষ্য করিয়া এক অতি সাধু সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন— "এমন এক শ্রেণীর লোক প্রস্তুত করিয়া

যইতে হইবে যাহাদের কৃষ্ণচর্মের নিম্নে ভারতীয় শোণিত প্রবাহিত হইবে সত্য, কিন্তু রুচি, মতামত ও চিন্তার ধারায় তাহারা হইবে সম্পূর্ণ ইংরেজভাবাপন্ন।"

অর্থাৎ এই চা-পানের বিরোধিতা করতে গিয়ে বাঙালির জাতিসত্ত্বা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন। তবু চা-পান আটকাতে পারেননি। তৎকালীন রবীনদ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর উপন্যাসে বহুবার চা-পানের উল্লেখ পাই। তিনি চা-পানের প্রশস্তি করে ১৯২৪ সালে 'শান্তিনিকেতনে চা-চক্র প্রবর্তন উপলক্ষে' 'সুসীম চা-চক্র' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন:

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়
চা-স্পৃহ চঞ্চল
চাতক দল চলো
চলো চলো হে!
টগবগ উচ্ছল
কাথলিতল জল
কল কল হে!

এল চীন-গগন হতে
পূর্বপবনস্রোতে
শ্যামল রসধরপুঞ্জ,
শ্রাবণবাসরে
রস ঝরঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দলবল হে!
.....(অংশ)

কচুরি তাহাতে খান দুই।

ছকা শাক ভাজা মতিচূর বঁদে খাজা

ফলারের জোগাড় বড়ই॥

নিখুতি জিলাপি গজা ছানাবড়া বড় মজা

শুনে শকশক করে লোলা।

হরেক রকম মণ্ডা যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা

যত খাই তত হয় তোলা॥

খুরী খুরী ক্ষীর তায় চাহিলে অধিক পায়

কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।

অনন্তর বাম হাতে দক্ষিণা পানের সাতে

উত্তম ফলার তাকে কই॥

মধ্যম ফলার

পরু চিঁড়ে শুকো দই মত্তমান ফাকা খই

খাসা মণ্ডা পাতপোরা হয়।

মধ্যম ফলার তবে বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণে কবে

দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়।

অধম ফলার

গুজে চিঁড়ে জলো দই তিত গুড় ধেনো খই

পেট ভরা যদি নাহি হয়।

রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে হাত দিয়ে পাত চাটে

অধম ফলার তাকে কয়॥

বাংলায় লিখিত শুধু রান্নার বই নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণিক রচনা আছে কল্যাণী দত্ত (১৯২৭-২০০৩)-র। তবে বাংলায় প্রথম রান্নার বই রচিত হয় প্রায় দুশো বছর আগে, ১৮৩১-এ, *পাক রাজেশ্বর* নামে। ১৮৫৮-এ প্রকাশিত হয় *ব্যঞ্জন রত্নাকর*। দুরো বই-ই প্রকাশিত হয় বর্ধমানের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায়। দুটো বই-ই মূলত রাজকীয় নবাবি খানা নিয়ে। তবে এই দুটি বই ঠিক কোন বই থেকে অনুবাদ করা, তার সমাধান করেছেন অরুণ নাগ তাঁর *চিত্রিত পদ্মে* (১৯৯৯) গ্রন্থে। তিনি জানিয়েছেন, 'সূপকার নাম নিয়ে বাঙলা ভাষায় অনেকদিন থেকে একটি মজাদার বিভ্রাট চলে আসছে। ফার্সি ভাষায় 'নেয়ামতখানা' বা 'নিয়ামৎখানা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ ভাণ্ডার, পাকশালা, পাকশালার ভাঁড়ার। বাদশা শাহজাহানের নিত্য পাকবিধি সংবলিত হয় *নেয়ামৎ খান* নামক ফার্সিগ্রন্থে। তার থেকে অনুবাদিত হয়ে বিবিধ প্রণালী স্থান পেয়েছে বর্ধমান মহারাজার আনুকূল্যে প্রকাশিত *পাক রাজেশ্বর* ও *ব্যঞ্জন রত্নাকর* গ্রন্থে। পাক রাজেশ্বর-এর লেখক বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার ভূমিকায় লিখছেন, '...নেয়ামৎ খান নামক পারসীয় পাকাবিধি' অথচ ব্যঞ্জন রত্নাকরের ভূমিকায় বলা হয়েছে, '...সাজাহান বাদসাহের রন্ধনাধ্যক্ষ 'নিয়ামৎ খাঁন আলি' নামক কোন ব্যক্তি... ব্যঞ্জনের নাম সম্বলিত, করণক্রিয়া লিখিয়া এক পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করেন, অএব পুস্তকের নাম 'নিয়ামৎ খাঁন বলিয়া প্রসিদ্ধ...' ইত্যাদি। ভারপ্রাপজত কর্মচারীর পদের নাম তার ব্যক্তিনামের সঙ্গে বেমালুম এক করে দেওয়া হলো।"

পরে এই নবাবিখানা যে জনপ্রিয় হয়েছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সিপাহি বিদ্রোহের কাছাকাছি সময় লখনৌয়ের নবাব নবাব ওয়াজ়িদ আলি শাহ যখন নির্বাসিত হয়ে কলকাতায় এলেন, তিনি সঙ্গে অনেক পাচক এনেছিলেন। ধীরে ধীরে কলকাতার পাক-প্রণালীতে তার কিছু প্রে্রভাব পড়তে শুরু করে। লখনৌ ঘরানার নবাবি খানার জনপ্রিয়তার কারণে ১৯05-এ কলকাতার চিৎপুরে রয়্যাল রেস্টোরেন্ট প্রতিষ্ঠা হয়। এই খাবারের দোকান এখনও চলছে।

ঘটনাচক্রে একজন পুরুষই বাঙালি রান্নার প্রথম বইটি লেখেন, বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। তার নাম *পাক-প্রণালী*। বইটি প্রথমে খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হয়, প্রকাশকাল ১৮৮৩ নাগাদ। অন্যান্য

বিশ্বজিৎ দত্ত
২৭-০৪-১৮

বই ছাড়াও তিনি *পথ্য রন্ধন* ও *মিষ্টান্ন পাক* নামে দুটি বই লিখেছিলেন। ভাত-ডাল-শুক্তো-ডালনা-ঘণ্ট-চচ্চড়ি-মাছের নানা পদ ইত্যাদি বাঙালির সাবেক রান্নার পাশাপাশি মাংসের কোর্মা-কালিয়া-মোগলাই-পোলাও-ওমলেট-টোস্ট-কাটলেট-পুড়িং-স্টু-কাস্টার্ড ইত্যাদির রন্ধন-প্রণালী এই বইতে দেওয়া আছে। রসুন-পেঁয়াজের ব্যবহারও দেখতে পাই। এর থেকে বোঝা যায়, বাঙালির চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাসে সংকরায়ণ ঘটে গেছে। অথচ লেখক একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান। এর পরের বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বইটিকে এখনো আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৯৬-৯৭ নাগাদ প্রকাশিত হয় প্রথম কোনো মহিলার লেখা বই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)-দৌহিত্র, পিতা দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪-১৮৮৪), প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী (১৮৭০ আনুমানিক-১৯৫০)-র *আমিষ ও নিরামিষ আহার*। এখানে নিপুণ রন্ধন-প্রণালীর সঙ্গে স্বাস্থ্যসম্মত রান্নাঘর, রান্নাঘরের সরঞ্জাম, উনুন, ভাঁড়ার ঘর, খাবার ঘর, এমনকী পুরাকালে যজ্ঞ ও আহারের বিবরণ আছে।

১৯২১ সালে প্রকাশিত হল কিরণলেখা রায় সংকলিত *বরেন্দ্র বন্ধন*। এখানে আছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের রন্ধন-প্রণালী। এই বইটির বিশেষত্ব অনেক। তার মধ্যে: সব রান্না 'আংসাইয়া' অর্থাৎ ভেজে রান্না; পাঁচফোড়নের ব্যবহার নেই; ফোড়নে দেওয়া হয় মূলত মেথি, তেজপাতা, লঙ্কা, জিরে, কালো জিরে, গোলমরিচ। দুটি বিশেষ রান্না এখানে পাচ্ছি: পায়রার রোস্ট, মেষের জিহ্বার রান্না। এই বই প্রাচীন বরেন্দ্র-রন্ধনের প্রণালী ও খাদ্যাভ্যাসের বিবরণ নয় শুধু, এক অর্থে দেখতে গেলে বাঙালির জাতীয়তাবাদীর স্মৃতিচিহ্ন এটি।

১৯২৪-এ প্রকাশিত হল বনলতা দেবীর *লক্ষ্মীশ্রী*। এখানে রন্ধন-প্রণালীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল সুগৃহিনী হওয়ার উপায়, গৃহস্থালির টুকিটাকি, ঔষুধ-টোটকা, সবজির চারা লাগানোর পদ্ধতি ইত্যাদি। তবে যিনি পাচক এবং ভালো রান্নার রহস্য জানেন তামকে বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ— এই চতুর্বিধ সাধনের উপাদান দেহ বা স্বাস্থ্য, সেই স্বাস্থ্য আবার খাদ্যের উপর নির্ভর করে, পাচক এই খাদ্যের বিধাতা।'

এটি যে গুরুমুখী বিদ্যা, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু রান্নার বই পড়ে কেউ ভালো রান্না করতে পারেন না। মা-ঠাকুমা-দিদিমা ও অন্যদের থেকে শেখা বিদ্যা এটি। রেণুকা দেবী চৌধুরাণী (১৯০৯-১৯৮৫)-র বিখ্যাত রান্নার বই রকমারি নিরামিষ রান্না (১৯৮৮)-তে লিখেছেন, 'সেই ছোট বয়স থেকেই যখনই যা রান্না শিখেছি, রান্না ক'রে তখনই তা খাতায় লিখে রেখেছি। নাম করা রাঁধুনী যাঁদের অনেক শিখেছ তাঁদের মধ্যে হরিচরণ চক্রবর্তী, বলিহার রাজবাড়ির পুরানো রান্নার ঠাকুর রুদ্র ঠাকুর, লীলা চক্রবর্তী, চন্দ্র ঠাকুর (চন্দ্রদা মোহিনীমোহন রায়ের ঠাকুর; অর্থাৎ আমার দিদিশাশুড়ির বাপের বাড়ির ঠাকুর)। এঁদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ছিল নুরা বাবুর্চি, যার নাম মাইনের খাতায় নুরা চক্রবত্রী লেখা থকত। তখনকার দিনে মুসলমান বাবুর্চির রান্না বার বাড়িতে কর্তারা খেতেন, কিন্তু সেটা সরকারীভাবে স্বীকৃত হতো না; সেইজন্য মাইনের খাতায় নুরা নামের সঙ্গে চক্রবর্তী পদবী যোগ। এইসব নামকরা ঠাকুর ও বাবুর্চির কাছে অনেক রান্না শেখার সুযোগ পেয়েছি। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে শিক্ষার কথা এখানে স্বীকার করি।

অনেক পরে দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পর কালীপুর থেকে মুক্তাগাছায় গেলে নুরা বাবুর্চিকে বাড়ির ভেতরে ডেকে এনে অনেক রান্না শিখেছি। নুরা বাবুর্চি আমাকে অভয় দিয়ে বলত, 'ভয় করবেন না মা, যদি কোনো সময় কিছু ভুলে যান, তখন গুরুর নাম স্মরণ করবেন, আমার নাম স্মরণ করবেন।'

রন্ধন-নৈপুণ্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মহৎ গুণ হিসেবে ধরা হত। রন্ধন-বিদ্যাকে শিল্প মনে করা হত সেই প্রাচীন ভারত থেকে। যার সূক্ষতা যত বেশি, সে ততই নিপুণ। বাঙালি সমাজেও এর নজির মেলে। ভোজনশিল্পী বাঙালি (২০০৪) গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) এর একটি সামাজিক ইতিহাস খুঁজে পেয়েছেন, '...আশ্চর্য হলো নিরামিষ রন্ধনশৈলী, যাকে বলা যায় বৈধব্যপ্রথারই উপজাতক। শুনতে অদ্ভুত কিন্তু কথাটা সত্য, যে এই উপবাসকারিণী একাহারিণী ভগিনীদের হাতেই বাঙালি রান্না পেয়েছে তার সূক্ষতম, সুকুমারতম ব্যঞ্জনা— যদিও ভক্ষ্য বিষয়ে শত শাসনে তাঁরা আবদ্ধ, অথবা হয়তো সেইজন্যেই। য়োরোপের মধ্যযুগে যেমন খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা, তাদের সংসারচ্যুত মঠের নিভৃতে, ধীরে ধীরে জারিত করেছিলেন দ্রাক্ষারস থেকে

অভিনব মদিরাপর্যায়, তেমনি আমাদের বিধবারা, সব খ্যাতিমান সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, সমাজের উপর মহত প্রতিশোধ নিয়েছিলেন রসনার সূক্ষ্মতর বোধ উদ্রিক করে, বাঙাল ভাষায় যাকে বলে 'তার'। পেঁয়াজ তাদের নিষিদ্ধ, গরম মশলা নিসিদ্ধ, এমনকি মুসুর ডালের মতো নিরীহ শস্যও চলে না— এ অবস্থায় তাঁরা হাত পাকিয়েছেন একটি নতুন স্টইলে অসামান্য রচনাশক্তির পরিচয় দিয়ে।'

১৯৪৩-৪৪-এর দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, উদ্‌বাস্তু সমাস্যা, খাদ্যবস্তুর কালোবাজারির মধ্যে ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হল। ১৯৯৭ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত পল গ্রিনো *Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-1944*-এ জানিয়েছেন, তাঁর মতে বাংলায় এ দুর্ভিক্ষে কমবেশি ৩৫ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন। অন্যান্য রাজনৈতিক ও প্রকৃতিক কারণের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণের উল্লেখ করেছেন: বাঙালির অভ্যাসগত আহার। চালের ভয়াবহ আকাল — আর ঐতিহ্যগত কারণেই এই খাদ্যবস্তুর বিকল্প হয় না বাঙালির কাছে। ১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্য এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে 'জবানবন্দী' নামে একটি একাঙ্ক নাটক লেখেন, একই বিষয় নিয়ে লেখেন পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন'। ১৯৪৪-এ এটি প্রথম অভিনীত হয় IPTA-র উদ্যোগে। আর বিভক্ত বাংলা, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের লেখক আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)-এর 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' (রচনাকাল: ১৯৪৭-৪৮) উপন্যাসেও ভাতের প্রত্যাশায় হাহাকার—

> 'দ্যাশ স্বাধীন হইল। এইবার চাউল হস্তা অইব। মানুষের আর দুকখ থাকব না।
>
> — হুঁ। জয়গুণ সায় দেয়। সে-ও সেদিন গাড়িতে শুনেছ, দেশ স্বাধীন হবে। ভাত-কাপড় সস্তা হবে। কেউ না খেয়ে মরবে না।'
>
> (*বাংলাদেশের নির্বাচিত উপন্যাস* ১। সম্পাদনা: অরুণ সেন। প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ১৯৯৯; পৃ. ১০৮)

২৭-০৪-১৪

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)-র *লাল সালু* (রচনাকাল: ১৯৪৭, প্রথম প্রকাশ: ১৯৪৮) উপন্যাসটি শেষ হয় এইভাবে:

> 'ছেলে-ছোকরারা আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে — তা দিনরাতের যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে মাঠে নধর কচি ধান নষ্ট হয়ে যায়, শিলার আঘাতে তার শিষ ঝরে ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকোর যাত্রীদের মতো আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে, যারা জানে না তারা পাথর হয়ে বসে থাকে।
>
> ...
>
> সামনে খেতে-খেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।'
>
> (ঐ, পৃ. ৮৫-৮৬)

কৃষি-নির্ভর বাঙালি জীবনের এই অসহায়তা যুগ-যুগান্তরের সঙ্গী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)-এর রচনায় গ্রাম-বাংলার দুঃখ, দারিদ্র, ছোটখাটো স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা পাওয়া যাবে। তাঁর *পুঁইমাচা* (১৯২৪) একটি বহুপঠিত গল্প। গরিব বামুনের মেয়ে ক্ষেন্তি। চেয়েচিন্তে বুড়ো পুঁইশাক আর কুচো চিংড়ি এনেছিল। এর জন্য মায়ের প্রচণ্ড বকুনিও শুনতে হল। একটা আধমরা পুঁইগাছ লাগিয়েছিল বাড়িতে। কিছুদিন পর তার বিয়ে হয়। সে খেতে বড় ভালবাসে। শ্বশুরবাড়িতে এজন্য খোশুনতে হয়। ওখানেই তার একবার বসন্ত হল। অযত্ন, অবহেলায়, অমানবিক আচরণে মৃত্যু। কিছুদিন পর তার নিজের বাড়িতে, সেদিন পৌষপার্বণ। 'সরুচাকলি' পিঠে হয়েছে।

> 'পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে ... রাতও তখন খুব বেশী। ... জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক্-র্-

র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটা যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে... দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাত বলিয়া উঠিল — দিদি বড় ভালবাসত...

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠোনের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল... যেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে... বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!...'

(বিভূতি রচনাবলী, ৫ম খণ্ড; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮২; পৃ. ৩৯৫)

এছাড়া বাঙালি-জীবনের পরিচয়জ্ঞাপক লোকাচার ও বহু খাদ্যবস্তুর প্রসঙ্গ তাঁর রচনায় পাই। যেমন, *অরন্ধনের নিমন্ত্রণ, অন্নপ্রাশন, বাটি চচ্চড়ি, তাল নবমী, চাউল, মশলাভূত, জলসত্র* ইত্যাদি।

তবে তাঁর অসাধারণ সাহিত্যকীর্তি *আদর্শ হিন্দু হোটেল* (১৯৪০)। পাচকও রন্ধনশিল্প নিয়ে তার আগে বা পরে এমন ধ্রুপদী উপন্যাস লেখা হয়নি। বেচু চক্রবর্তীর আদর্শ হিন্দু হোটেল-এর পাচক-বামুন হাজারি দেবশর্মা, উপাধি চক্রবর্তী। সে-ই কেন্দ্রীয় চরিত্র। তারই রান্নার হাতযশে হোটেলের রমরমা। কিন্তু সে-ই সবচেয়ে শোষিত, তার দারিদ্রের শেষ নেই। তার ওপর সারাক্ষণ তাকে গঞ্জনা সহিতে হয়, উদয়াস্ত খাটুনির পরও। তার অনেক দিনের ইচ্ছে একটি ভালো ভাতের হোটেল খোলার। যেখানে ডালে ফ্যান দেওয়া হবে না, পচা মাছ কড়া করে ভেজে ঝাল বানিয়ে খদ্দেরকে ঠকানো হবে না। সে রান্নাকে শিল্প মনে করে। এখানে ভেজাল চলে না, যেকোনো শিল্পেরই প্রধান শর্ত।

'এই রান্না শিখিতে কি পরিশ্রমই না সে করিয়াছে।

রান্না কি করিয়া শিখিল, সে এক ইতিহাস।

হাজারির মনে আছে, তাহাদের এড়োশোলা গ্রামে সেকালের একজন প্রাচীনা ব্রাহ্মণ বিধবা থাকিতেন, তখন হাজারির বয়স নয়-দশ বছর। রান্নায় তাঁর শুধু সাধারণ ধরনের সুখ্যাতি নয়, অসাধারণ সুনামও ছিল। গ্রামেও বাহিরেও অনেক জায়গায় তাঁর নাম জানিত।

হাজারির মা তাঁকে বলিল— খুড়ীমা, আপনার তো বয়েস হয়েছে। কবে চলে যাবেন— আপনার গুণ আমাকে দিয়ে যান। চিরকাল আপনার নাম করবো।

তিনি বলেন— আচ্ছা তোকে বউ একটা জিনিস দিয়ে যাব। কি ক'রে নিরামিষ চচ্চড়ি রাঁধতে হয় সেটাই তোকে দিয়ে যাবো।

সেই বৃদ্ধা হাজারির মাকে এই একটিমাত্র জিনিস শিখাইয়া ছিলেন এবং সেই একটি জিনিস রাঁধিবার গুণেই মায়ের নাম ও-দিকের আট-দশখানা গ্রামে প্রসিদ্ধ ছিল। শুনিতে অতি সামান্য জিনিস— নিরামিষ চচ্চড়ি, ওর মধ্যে আছেটা কি? কিন্তু একবার জবাব পাইতে হইলে হাজারির মায়ের হাতের নিরামিষ চচ্চড়ি খাইতে হয়।

দুঃখের বিষয় তিনি আর বাঁচিয়া নাই, ও-বৎসর দেহ রাখিয়াছেন। হাজারির মায়ের রন্ধন-প্রতিভা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছে— চচ্চড়ি এত চমৎকার যে বেচু চক্কোত্তির হোটেলে একবার যে কাইতে যায়, সে একবার ঘুরিয়া সেখানেই আসে। রেল-বাজারে তো অতগুলো হোটেল রহিয়াছে— সে আর কোথাও যাইবে না। আজ মাংস রান্নার ভার তাহার উপর পড়িল। খদ্দেররা খাইয়া খুব তারিফও করিল।'

29-8-16

(বিভূতিভূষণ উপন্যাস সমগ্র, ১ম খণ্ড। সম্পাদনা: তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভম, কলকাতা, ২০১২।পৃ. ১৯৬)

'হাজারি ঠাকুর মাংস রাঁধিবার একটি বিশেষ প্রণালী জানে, মাংসে জল না দিয়া নেপালী ধরনের মাংস রান্নার কায়দা সে তাহাদের গ্রামের নেপাল-ফেরত ডাক্তার শিবচরণ গাঙ্গুলীর স্ত্রীর নিকট অনেকদিন আগে শিখিয়াছিল। কিন্তু হোটেলে দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার মধ্যে মাংস কোনোদিনই থাকে না— তবে বাঁধা খরিদ্দারগণের মনতুষ্টির জন্য মাসে একবার বা দুবার মাংস দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বটে— সে রান্নার মধ্যে বিশেষ কৌশল দেখাইতে গেল চলে না, বা হাজারির ইচ্ছাও করে না— তেমন ভাল শ্রোতা না পাইলে গায়কের ভাল গান করিতে ইচ্ছা করে না, তেমনি।'

(ঐ, পৃ. ২০২)

রান্নার বই পড়ে, রেসেপি জেনে যে ভালো রান্না শেখা যায় না, এ যে গুরুমুখী বিদ্যা, রান্নার ওস্তাদ শিল্পী হাজারির একটি কথায় ধরা পড়ে। জমিদারকন্যা অতসীর আবদার, তাকে রান্না শিখিয়ে দিতে হবে। নাছোড় অতসীকে দরিদ্র হাজারি বলে:

'ভাল রান্না শেখা একদিনে হয় না মা। মুখে বলে দিলেও হয় না। তোমার পেছনে আমায় লেগে থাকতে হবে অন্তত ঝাড়া দু-তিন মাস। হাত ধরে বলে দিতে হবে— তুমি রাঁধবে। আমি কাছে দাঁড়িয়ে তোমার ভুল ধরিয়ে দেবো, এ না হোলে শিক্ষা হয় না। তুমি আমার টেঁপির মত, তোমাকে ছেঁদো কথা বলে ফাঁকি দেবো না মা, ছেলেমানুষ, শিখতে চাইতে শিখিয়ে আমার অসাধ নয়। কিন্তু কি'করে সময় পাবো যে তোমায় শেখাবো মা।'

২৯-৪-১৪

(ঐ, পৃ.

২৫৫)

হাজারির এই অন্তিম জবাবে—

'অতসী সপ্রশংস দৃষ্টিতে হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। বিশেষজ্ঞ ওস্তাদের মুখের কথা। গুরুত্বপূর্ণ কথা—বাজে ছেঁদো কথা নয়, অনভিজ্ঞ আনাড়ির কথা নয়। তাহার চোখ হাজার দরিদ্র রাঁধুনী বামুন পিতা নয় — যে ব্যবসায় সে রাঁধিয়াছে, সেই ব্যবসায়ে একজন অভিজ্ঞ, ওস্তাদ পাকা শিল্পী।'

(ঐ, পৃ.

২৫৬)

আদর্শ হিন্দু হোটেল-এ মরশুমের সময় হামেশাই ইলিশ মাছ হত। এই ইলিশ বাঙালির প্রিয়তম বললেও কম বলা হয়। 'মাছে ভাতে বাঙালি'-র ইলিশ রীতিমত আইডেন্টিকাল। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)-র 'ইলিশ' নামে একটি বিখ্যাত কবিতা আছে—

ইলিশ

আকাশে আষাঢ় এলো; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।

মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেল সারি

বৃষ্টিতে ধূমল: পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি

27-8-18

বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।

মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন-অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল

আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি

ছোটো নৌকাগুলি, প্রাণপণে ফ্যালে জাল, টানে দড়ি

অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল।

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে

জলের উজ্জ্বল শস্য রাশি রাশি ইলিশের শব,

নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।

তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে-ঘরে

ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার

সরস সর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ উৎসব।

(বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ় পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪)

এমন কোনো বাংলা রান্নার বই নেই, যেখানে এই 'জলের উজ্জ্বল শস্য'-র বিবিধ পদের বর্ণনা নেই। এর বাইরে, টাটকা ইলিশের টক খাওয়ার চল আছে রাঢ় বাংলায়।

29-8-18

ইলিশ নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)-এর একটি লেখা থেকে জানতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ইলিশ মাছ খেতে খুব ভালবাসতেন:

> '... তখন স্বামীজির শরীর খুব খারাপ। একটা যাই যাই রব উঠে গেছে। প্রায়ই তিনি বলেন, তাঁকে শিগগিরি চলে যেতে হবে। তিনি চল্লিশ বছরের বেশি বাঁচবেন না। একদিন তিনি উপোস করেছেন, পরদিন পরমহংসদেবের ঘরে বসে ধ্যান করলেন প্রায় তিন ঘণ্টা। তারপরই তাঁর খুব খিদে পেয়ে গেল। তিনি ঠিক করলেন, আজ তিনি ভাত, মাছ, তরকারি সব এাবেন। পুরোপুরি ঝাল ও মশলা দিয়ে। তখন গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরা হল, প্রেমানন্দ স্বামী সেই মাছ কিনেছেন খবর পেয়ে বিবেকানন্দ উপস্থিত হয়ে কিনলেন সেই টাটকা ইলিশ। সেদিন বেলুড় মঠে লোকজন বেশি নেই। তাই প্রেমানন্দকে বললেন, শুধু ঝোল নয়, গোটাকতক মাছভাজা করতে বলো, ভাজা স্বাদই অপূর্ব। আর একটু মাছের টক করতেও বলে দিও।
>
> সেদিন তিনি খেলেন ইলিশ মাছের তেল দিয়ে ভাত, ডাল দিয়ে ভাজা মাছ, ঝোলে তেমন ঝাল হয়নি বলে কামচালঙ্কা ডলে নিলেন। শেস পাতে মাছের অম্বল। সেইসব খয়ে তাঁর শরীরে এমনই শক্তি এল যে, লাইব্রেরি ঘরে এসে কয়েকটি ছাত্রকে পড়াতে লাগলেন পাণিনির ব্যাকরণের তো নীরস ও শক্ত বিষয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অনেকদিন পরে হাঁটতেও বেরোলেন। অনেক ব্যাপারেই তাঁর প্রবল উৎসাহ। অনেক গল্প করলেন অন্যদের সঙ্গে। সেই রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হল।'
>
> (যা দেখি, যা শুনি, একা একা কথা বলি। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ অগস্ট ২০১১)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)-এর রচনাতেও বাঙালি খাবার-দাবারের বহু বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'কালের মন্দিরা' (১৯৫৩)।

"ওদিকে পারসিকেরা অঙ্গার কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া শূল্য মাংসরন্ধন করিতেছে; দগ্ধ মাংসের বেশার-মিশ্র সুগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে লুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।

চিত্রক বলিল— 'হিঙ্গু-পলাণ্ডু-ভোজী ম্লেচ্ছগুলো রাঁধে ভাল। জম্বুক, রাত্রে আমাদের ভোজনের কি ব্যবস্থা?'

জম্বুক ভোজ্যবস্তুর দীর্ঘ তালিকা দিল। প্রথমেই মিষ্টান্নঃ মধু পিষ্টক লড্ডু ও ক্ষীর; তারপর শাক ঘৃত-তণ্ডুল মুদ্‌গ-সূপ, ময়ূর ডিম্ব; সর্বশেষে রোটিকা পুরোডাশ ও তিন প্রকার অবদংশ সহ উখ্য মাংস শূল্য মাংস ও দধি।"

(শরদিন্দু অমনিবাস, তৃতীয় খণ্ড। ঐতিহাসিক উপন্যাস: শরদন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ানন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৬৭)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)-এর জন্মস্থান হুগলির দেবানন্দপুরের কাছে কৃষ্ণপুরে প্রতিবছর ১লা মাঘ মাছের মেলা বসে। প্রায় ৫০০ বছর ধরে। কথিত আছে, সপ্তগ্রামের রাজার বাড়িতে হঠাৎ উপস্থিত ৭০০ বৈষ্ণব। তামরা ইলিশ মাছের ঝোল আর আমের টক খেতে চান। সে সময়টা এ-দুটোরই মরসুম নয়। রাজার ভাইপো ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। নাম রঘুনাথ। তিনি মনে মনে কৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন উদ্ধারের জন্য। রঘুনাথের ভক্তির জোরেই রাজার পুকুরে ধরা পড়ল ইলিশ আর মাঘের শীতেও আম গাছে ঝুলতে দেখা গেল আম। সেই থেকেই এই মেলার শুরু। আর এখন তো ইলিশের বড়ই আকাল, মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে।

আবার ফিরে আসি শরদিন্দুর কথায়, প্রাচীন বাংলার খাবার-দাবারের যে বিবরণ শরদিন্দু দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, পরিবেশনের শুরুতেই মিষ্টান্ন দেওয়া হত, এখনকার রেওয়াজ শেষপাতে। আর, ঐ যে হিঙ্গু অর্থাৎ হিং আর পলাণ্ডু বা পেঁয়াজ আদিযুগ থেকে ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্তও বাঙালি গ্রহণ করেনি। এখন তো নিরামিস রান্নায় হিঙের ব্যবহার হয়। নিরামিষ

২৭-৪-১৪

পাঁঠার মাংস বা পাঁঠাবলির মাংস রান্নায় হিং অপরিহার্য। তবে পেঁয়াজের ব্যবহার এখন সর্বাত্মক হলেও নিরামিষে পরিত্যাজ্য।

কিন্তু মহাভারতে হিঙের ব্যবহার আছে। বাঙালিরা হিং পেয়েছে আফগানদের থেকে। চরক পেঁয়াজের গুণের কথা লিখে গিয়েছেন। রসুনের নানা উপকারিতার কথা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আছে। রসুন তো গ্রামগঞ্জের অনেক বাড়িতে এখনও ঢোকে না, হিন্দু বাড়িতে।

শরদিন্দুর 'অশরীরিণী' গল্পে ইক্‌মিক কুকারের উল্লেখ পাই।

(একশো বছরের সেরা ভৌতিক। সম্পাদনা। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বারিদবরণ ঘোষ। মিত্র ও ঘোষ প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১২৬)

এর একটা ইতিহাস আছে। বাংলা চলচ্চিত্র-অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের পিতামহ ডা. ইন্দুমাধব মল্লিক (১৮৬৯-১৯১৭) এর আবিষ্কর্তা, তিনি এর পেটেন্টও পান। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৮৭২-১৯৩৯)-এর *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮৬)-এ আছে—

> 'ডা. ইন্দুমাধব মল্লিক কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত বলিয়া তাঁহার নামের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যবর্ণ যোগে বস্তুর নাম। পাক করিবার চুল্লী; বাষ্পবলে সিদ্ধ করিয়া লইবার মত ধাতু নির্মিত চুল্লা (Stove), Icmic cooker.'

এটাই হল এখনকার প্রেসার কুকারের আদিরূপ। শরদিন্দুর ঐতি্সিক উপন্যাসে প্রাচীন বাংলার আহারে যে শাকের উল্লেখ পাই, এখনও তা বাঙালির নিত্য ভোজনসঙ্গী। শুধু বর্ষাকালে শাকভক্ষণ নিষিদ্ধ।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৮০-১৯৬১)-র কিশোর উপন্যাস ভোম্বল সর্দার (১৯৫৮)-এ জমিদারবাবুর নিমন্ত্রণবাড়ির খাদ্যতালিকায় পাচ্ছি:

> '... তখন লুচি শাকভাজা, বেগুনভাজা ও কুমড়োর ছোঁকা পড়ে গেছে, মুড়িঘণ্ট আসে আসে; তার নাম শোনা যাচ্ছে।'

(কিশোর গল্প; খগেন্দ্রনাথ মিত্র/ শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ' ৩১৯)

লক্ষ্যণীয়, লুচির সঙ্গে শাকও দেওয়া হত। শাক মঙ্গলের প্রতীকও বটে। আর মহাভারতে বনপর্বে ধর্মরূপী যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে যখন প্রশ্ন করেন, 'সুখী কে?' যুধিষ্ঠির উত্তর দেন:

> 'যে লোক ঋণী ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অষ্টমভাগে (সন্ধ্যাকালে) শাক রন্ধন করে, সে-ই সুখী।'
>
> (কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসকৃত মহাভারত। সারানুবাদ: রাজশেখর বসু। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ২৬৪)

তাই বাঙালি-রান্না নিয়ে লেখা সমস্ত বইতে শাকের বহুরকমের পদের উল্লেখ পাই। গরিব, সাধারণ মানুষের পেট ভরাবার প্রধান উপাদান শাক। সচ্ছল পরিবারেও তার প্রবেশাধিকার অবাধ।

এছাড়াও বাংলা সাহিত্যে খাবারদাবারের বিবরণের ছড়াছড়ি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)-সৃষ্ট টেনিদার খাবারদাবারের ফিরিস্তি লিখতে বসলেই একটা মহাভারত হয়ে যাবে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে উল্লেখযোগ্য প্রথম প্রকাশিত রান্নার বই লালী মজুমদার (১৯০৮-২০০৭) ও তাঁর কন্যা কমলা চট্টোপাধ্যায়ের লেখা *রান্নার বই* (আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭৯)। এই বইতে লাউশাকের একটা নতুন পদের খোঁজ পাই। 'লাউশাকের বড়া'। এছাড়া রান্নাবান্নার টুকিটাকি বর্ণনা ও পরামর্শ দেওয়া আছে। যেমন:

> 'অ্যালুমিনিয়ামের বাসনে কালি ধরে গেলে, সমান পরিমাণে লেবুর রস ও জল, বা একটু কাঁচা ভিনিগার দিয়ে ভালো করে ঘষলে কিম্বা ফুটিয়ে নিলে কালি ছেড়ে যায়।'

২৭-৪-১৪

বাঙালি ঘরোয়া রান্নার সঙ্গে ইউরোপ, অন্যান্য দেশ ও ভারতীয় অন্যান্য খাবারের মিশেল পাওয়া যায়। যেমন: স্কচ্ ব্রথ্, আখনির পোলাও, চিনে ও স্প্যানিশ ওমলেট, ডিম স্ক্র্যাম্ব্ল, মাছের ব্রোকেট, শামি কাবাব, ভিন্দালু, তুর্কির সারমালি, কাগজি লেবুর মার্মালেড, বয়েল্ড কাস্টার্ড, মাছের আফ্রিকান স্টু ইত্যাদি। এতে প্রমাণ হয়, বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের বিশুদ্ধতা বলে কিছু হয় না। এই উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে। এর নজির পরবর্তীকালে প্রকাশিত বইগুলোতেও পাই। বুদ্ধদেব বসুর 'মেঘ বৃষ্টি রোদ' রচনায় বাঙালি ভোজের একটি অপূর্ব বর্ণনা আছে:

> 'শিউলিফুলের মত সাদা সুগন্ধী সরু চালের ভাত। পাশেই রাখা কাঁসার ছোট বাটিতে সোনা রঙের গাওয়া ঘি। হালকা সবুজ কাগজী লেবু আর গাঢ় সবুজ কামচালঙ্কা। ঝিরঝিরে আলুভাজা, মুচমুচে কাচকি মাছের ঝুরি। কুচিকুচি নিমপাতা আর খেসারি ডালের বন্ধনে ভাজা বড়া। ক্রিম রঙের সুস্বাদু নারকোল চিংড়ী। কুচকুচে কালো কইমাছ টুকটুকে লাল তেলের বিছানায় ফুলকপির বালিশে শোয়ানো। রূপোলী ইলিশের সোনালী রাইসর্ষের সাথে রাজযোটক। ল্যাজামুড়োর সাথে কচি কুমড়োর কালজিরে ছিটানো ঝোল। ধনে পাতা, নারকেল আর কচুশাকের অপরূপ মেলবন্ধন। তেজপাতার সুগন্ধে ভরা নারকেল কোরা ছড়ানো ঘন মুসুরি ডাল। আদা, পেঁয়াজ আর খণ্ড খণ্ড আলুর সঙ্গে বনেদী মাটন। মাংসাল মাগুরের মেজাজী কালিয়া।'

এই বর্ণনায় উল্লেখিত নারকেল চিংড়ি আসলে বাঙালির অতিপ্রিয় 'চিংড়িমাছের মালাইকারি।' মিলন দত্তর *বাঙালির খাদ্যকোষ* (দে'জ় পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫)-এ আছে, মালয় উপদ্বীপের অধিবাসী তামিলরা এই রান্না প্রথম ভারতে আনে। বাঙালিরা শুধু তার নিজস্ব রসনাতৃপ্তির জন্য গড়েপিটে নিয়েছে।

১৯৭১-এর পয়লা জানুয়ারি থেকে চার তারিখ পর্যন্ত 'ভোজনশিল্পী বাঙালি' শিরোনামে বুদ্ধদেব বসুর ধারাবাহিক একটি লেখা বেরোয়। তার অনেক পরে ২০০৪ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (প্রকাশক: দময়ন্তী বসু সিং)। বাঙালির খাদ্যাভ্যাস, রন্ধনশিল্প ও বাঙালির

২৭-৪-১৮

খাদ্যরুচি ও তার সামাজিক ইতিহাস নিয়ে কোনো বাঙালি সাহিত্যিকের এটিই প্রথম ও শেষ বই। তাঁর স্ত্রী সাহিত্যিক প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬)-র সঙ্গে যৌথভাবে একটি রান্নার বই লেখারও পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। ভোজনশিল্পী বাঙালি একদিক থেকে দেখলে বাঙালি জীবনযাপনের অনালোকিত আত্মপরিচয়ের ইতিহাস। সেখানে তিনি লেখেন:

> 'আমাদের মাতৃভাষা একটি বিভাগে অসামান্যরকম পটীয়সী— তা হ'লো বিবিধ খাদ্যপ্রকরণের নামকরণ। ফরাশিরা বাগ্‌বহুল বিশেষণ বসিয়ে তাদের মেনুগুলোকে জমকালো ক'রে তোলে, কিন্তু ছোট্ট এক শব্দের নাম বানাতে বাঙালির মতো ওস্তাদ কেউ নেই। এ কি আশ্চর্য নয় যে দম জিনিশটা অনন্যভাবে শুধু আলুরই অধিকারভুক্ত, এবং তিনি এতই সতী সাধ্বী যে আলুর সঙ্গে কুমড়ো জুড়ে দিলেই তিনি দম-ত্ব হারিয়ে ছক্কায় নামান্তরিত হন।'
>
> (বুদ্ধদেব বসুর জীবন: সমীর সেনগুপ্ত। বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৮; পৃ. ৩৮৩)

আশ্চর্যের বিষয়, সমস্ত চর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর নাম এসে যায়। তাঁরই পরিবারের পূর্ণিমা ঠাকুর (১৯০৮-?)-এর লেখা রান্নার বই *ঠাকুরবাড়ির রান্না* (আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮৬)। এখানেও সাবেকি বাঙালি রান্নার পাশাপাশি কন্টিনেন্টাল ও মোগলাই রান্নার রেসিপি পাই, যেগুলো ঠাকুর-পরিবারে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া হত। এই তালিকায় রাঢ় বাংলার প্রভাবও পাচ্ছি। যেমন: আমশোল, নানা রকমের পোস্ত, বিউলির ডাল, মৌরলা মাছের টক ইত্যাদি।

তাঁর মৃত্যুর পর, ১৯৮৮-এ প্রকাশিত হয় রেণুকা দেবী চৌধুরানী (১৯০৯-১৯৮৫)-র *রকমারি নিরামিষ রান্না* আর ২০০৩-এ *রকমারি আমিষ রান্না*। প্রথমটির প্রকাশক 'সুবর্ণরেখা, কলকাতা', দ্বিতীয়টির 'আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.'। দুটি খণ্ডে প্রচুর রান্নার রেসিপি আছে। ময়মনসিংহের

২৭-৪-১৪

জমিদার বাড়ির বউ ছিলেন তিনি। ফলে উচ্চবিত্তদের খাবারদাবারের বহু রেসিপি এখানে আছে। তেমনি পারিবারিক রান্নাবান্নার বহু গোপন রেসিপিও ফাঁস করেছেন তিনি।

> "জংলী পশুপাখির মাংস রান্নার একটা আলাদা কায়দা আছে। ...একটা পারিবারিক গুহ্যতত্ত্বের মতোএবং গুরুমুখ ছাড়া এ জ্ঞানলাভের সুযোগ কম। এ সম্বন্ধে আমার 'আমিষ খণ্ডে' বিস্তারিত লিখেছি।"

সাধারণত ওপার বাংলার রান্নায় বিউলির ডাল দেখা যায় না। কিন্তু রকমারি নিরামিষ রান্না-য় বিউলির ডালের উল্লেখ আছে (পৃ. ১৩৫)।

প্রণব রায় লেখেন *বাংলার খাবার* (সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭)। এখানে প্রাচীন বাংলা থেকে এখনকার বাঙালি খাদ্যের ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। বিশেষত বাঙালির প্রিয় মিষ্টান্ন বিষয়ে আলোচনা বিস্তৃত। এখানেই পাই, বহুল প্রচারিত তথ্য, রসগোল্লার আবিষ্কর্তা নবীনচন্দ্র দাস— এটা ঠিক নয়। তাঁর মতে, ব্রজ ময়রা হাইকোর্টের কাছাকাছি দোকানে ১৮৬৬ সালে প্রথম রসসগোল্লা তৈরি করেন। আবার অন্য মতও হাজির করেছেন: নদিয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামের হারাধন ময়রা ১৮৪৬-৪৭ সালে প্রথম রসগোল্লা তৈরি করেন।

তবে বাংলা ভাষায় রচিত সবচেয়ে জনপ্রিয় বই বেলা দে-র *গৃহিণী অভিধান*। প্রকাশক পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৭৬। এটিই আসল বই। জনপ্রিয়তার কারণে কলেজ স্ট্রিট পাড়া নকল বেলা দে-র রান্নার বইতে ছেয়ে গেছে, প্রকাশকও আলাদা আলাদা। এই আসল বইটির জন্রিয়তার কারণ, শুধু গৃহিণী নয়, বাঙালি বাড়ির কাছে এটি একটি টেক্সট বইয়ের মতো। একটা পাঁজি (যেখানে কোন দিন, কোন তিথিতে, কী খাওয়া নিষিদ্ধ) আর বেলা দে-র বইখানা থাকলে হিন্দু বাঙালি বাড়ি নিশ্চিন্ত! সংসার পরিচালনা, জমা-খরচের হিসেব, ঘর সাজানো, ফল-ফুলের বাগান করা, সবজি ফলানো, মাছ চাস, হাঁস-মুরগি-গরু পালন, ধাত্রীবিদ্যা, শিশু চিকিৎসা, বৃদ্ধ বা রোগীদের সেবা, ছেলেমেয়েদের নামকরণ, পরিবার পরিকল্পনা, ফার্স্ট এড, রূপচর্চা, ব্যায়াম, সেলাই ও কাটিং, উলবোনা ও হাতের কাজ ইত্যাদি, কী নেই এ-বইতে!

২৭-৪-১৪

সামরান হুদা-র *অতঃপর অন্তঃপুরে* (গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪) একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। মুসলমান বাঙালি অন্তঃপুরে খাদ্যাভ্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে এখানে। ১৯৯৬-এ প্রকাশিত হয় *মুসলিম রান্না: ঢাকা লাহোর লখনৌ*, রচয়িতা জবীন রহমান (সুবর্ণরেখা, কলকাতা)। আজকাল জনপ্রিয় পুলাও, বিরিয়ানি, কোর্মা, কালিয়া কাবাব, কোফ্‌তা-র প্রামাণিক রেসিপি এখানে পাওয়া যায়।

এছাড়া প্রকাশিত হয়ে চলেছে বহু রান্না সংক্রান্ত বই। বাঙালির খাদ্যাভ্যাস নিয়ে চর্চা করেছেন অনেক বিদগ্ধ মানুষ। উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি ও তথ্য পেয়েছি রাজিকা ভাদুড়ি, পুষ্পেশ পন্ট ও হুমা মোশিন, চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত (১৯২০-২০০০), সুকুমার সেন (১৮৯৮-১৯৬৩), শ্রীপান্থ (১৯৩২-২০০৪), প্রতাপকুমার রায় (১৯২১-২০১২), তপন রায়চৌধুরী, সৈয়দ মুজতবা আলি (১৯০৪-১৯৭৪), বুদ্ধদেব গুহ, কল্যাণী দত্ত (১৯২৭-২০০৩), অরুণ নাগ, দামু মুখোপাধ্যায়, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী (১৯০০-১৯৭২), দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৮৯৪-১৯৬১), শশিশেখর বসু (১৮৭৪-১৯৫৫), যমদত্ত (১৮৯৪-১৯৭৫), পুণ্যলতা চক্রবর্তী (১৮৯০-১৯৭৪), রূপা বন্দ্যোপাধ্যেয়, পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬), কুণাল চক্রবর্তী, উৎসা রায়, জহর সরকার, গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩), আব্দুল জব্বার (১৯৩৩-২০০৯), স্বপ্নময় চক্রবর্তী, একরাম আলি, শংকর, সুপ্রিয়া দেবী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) প্রমুখের লেখায়।

এই মুহূর্তে ভুবনায়নের যুগে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে আরও বহু দেশ এবং সর্বভারতীয় প্রবল প্রভাব লক্ষ করি। বাঙালি সংস্কৃতির গ্রহণক্ষমতাও অপরিসীম। বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০) তাঁর 'বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণ' নিবন্ধে লিখেছিলেন—

> "জাতিশুদ্ধতা বিজ্ঞানীদের কাছে 'মিথ' বা কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। বর্ণকৌলিনের বিবেচ্য কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকলে, তা কৃষ্টিগত ও কুলাচারগত, জৈবিক শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার সঙ্গে তার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই।"

(পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড। প্রকাশ ভবন, কলকাতা. ১৯৫৭, পৃ. ৪৯)

চিন্ময় গুহ
29-8-18

খাদ্য একটি 'জৈবিক' চাহিদা। তারও 'শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা' নেই।

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৯-এ মুক্তি পায় অসামান্য জনপ্রিয় একটি বাংলা চলচ্চিত্র 'প্রথম কদম ফুল'। সুধীন দাশগুপ্ত সুরারোপিত পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি গান গেয়েছিলেন মান্না দে, যা আজও সমান জনপ্রিয়:

লা...লা...লা...

আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না — আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না

ইস্তামবুল গিয়ে, জাপান কাবুল গিয়ে

শিখেছি শহরেই রান্না

আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না

হাতে নিয়ে ডেক্‌চি, যেই তুলে হেঁচকি

হাতে নিয়ে ডেক্‌চি, যেই তুলে হেঁচকি

বিরিয়ানি কোরমা, পটলের দোরমা

মিলেমিশে হয়ে যায় প্যারিসের ছেঁচকি

পাবেন না মশলাটা, যেখানেই যান না

আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না

সুইজারল্যান্ড গিয়ে, ইজিপ্ট হল্যান্ড গিয়ে

২৭-৪-১৪

শিখেছি নতুন এই রান্না

আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না

শোনো ভাই কুন্তী, নিয়ে এসো খুন্তি

ওহে ভাই হাজরা, হাফ হাড় পাঁজরা

ওহে ভাই হাজরা, হাফ হাড় পাঁজরা

আস্ত মাছেই করি ডেভিল অগুনতি

মোটেই হবে না ভুঁড়ি, যত খুশি খান না

আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না

না-কেটেই খাসিটা, দাঁত কাটি বাসিটা

না-কেটেই খাসিটা, দাঁত কাটি বাসিটা

ভেদ পড়ে নজরে, বলে দিই সজোরে

মাংসটা ঝাল হবে, মেটে হবে আশিটা

পেটে গিয়ে ব্যা ব্যা করে জুড়ে দেবে কান্না

আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না

খাইবার পাশ গিয়ে, রোম সাইপ্রাস গিয়ে

শিখেছি দারুণ এই রান্না

আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না

আমি শ্রীশ্রীভজহরি মান্না...

রক্ষণশীলতা থেকে আড় ভেঙে বেরিয়ে বাঙালি-রুচি কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তার একটি ছবি হয়তো এখানে পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে, বিদেশি খাবার-দাবার কীভাবে তারা আপন করে নিচ্ছে। শুধু মশলাপাতি, পদ্ধতির রকমফের ঘটিয়ে; সহজলভ্যতা, ভৌগোলিকতা, প্রকৃতি আর বাঙালি রসনা-তৃপ্তির নিজস্ব শর্তে। 'রসনা' কথাটি এসেছে সংস্কৃত 'রস' শব্দ থেকে। খাদ্যের রস ছ'-রকমের: মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়। বাঙালির খাদ্য পরিবেশনায় বিশিষ্টতা এই যে, শুরু হয় তেতো দিয়ে। তেতো মানে: শুক্তো, নিমপাতা ভাজা, নিম-বেগুন, উচ্ছে ভাজা, গিমে শাকের চচ্চড়ি। আর শেষ হয় চাটনি, মিষ্টি, পায়েস বা টক দিয়ে। ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক আর বহু সংস্কৃতির মিলনের ফলে বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের ক্রম-পরিবর্তন হতে থাকলেও পরিবেশনের এই বিশিষ্টতা সেই আদিকাল থেকে এখনো চলে আসছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উদ্ভাবনী শক্তি বা সৃজনশীলতা আর সূক্ষ্মতা। *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (*আদি পর্ব*)-এ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'মধ্যযুগীয় সুবিস্তৃত বাঙলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর আহার্য ও পানীয় সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় এবং তাহার মধ্যে রুচি ও রসনার সূক্ষ্ম বোধ সুস্পষ্ট, রন্ধনকলার যে সূক্ষ্ম ও জটিল পরিচয় বিদ্যমান, পাদিপর্বের সংক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে কোথাও সে-পরিচয় ধরা পড়ে নাই। এ-পর্বের জীবনের এই দিকটায় বাঙালীর বুদ্ধি ও কল্পনা প্রসারিত হয় নাই, প্রমাণের অভাবে সে-কথা জোর করিয়া বলা যায় না, তবে সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুপস্থিত, তাহা স্বীকার করিতেই হয়।' (দে'জ় পাবলিশিং সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪৩)।

মধ্যযুগের সেই সূক্ষ্মতা এখন নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে না। বহু রাজ্যের, বহু দেশের খাদ্য-সংস্কৃতির মিলনে আজকের বাঙালি-মনন যুগোপযোগী নতুন এক সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। যেমন বিরিয়ানি, সারা ভারতেই পরিচিত একটি খাবার। কলকাতায় বিরিয়ানিসহ অন্যান্য 'মুসলমানি খাবার' এল অযোধ্যায় শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ (১৩-০৭-১৮২২ - ২১-০৯-১৯৯৭)-র ১৮৫৬-এ মেটিয়াব্রুজে স্থায়ীভাবে বসবাসের সূত্রে। আবার মিলন দত্ত

২৭-৩-১৪

বাঙালির খাদ্যকোষ (দে'জ় পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২৭৯-৮০)-এ লিখেছেন, "বিরিয়ানির আদি ভূমি পারস্য। ভারতীয় খাদ্যের ইতিহাসকার টি কে আচার্যের মতে চতুর্দশ শতকে এই খাবারটি ভারতে এসেছে। 'ঢাকা পচাশ বরশ পহলে' বইয়ে হাকিম হাবিবুর রহমান দাবি করেছেন 'পর্তুগিজরা এদেশে আলু আমদানি করার পর বিরিয়ানিতে আলুর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর আগে বিরিয়ানিতে কেবল মাংসের ব্যবহার ছিল। আসল মুঘল খাবার মাংস প্রধান। ঢাকার বিরিয়ানির নাম ছিল 'দোগাসা'। ঢাকায় 'মোতাজান' নামক যে রঙিন ও মিষ্টি বিরিয়ানি পাওয়া যেত তার উপাদান ছিল ছাগল, ভেড়া বা দুম্বার কারও মতে বিরিয়ানি ছিল মুসলিম শাসকদের সেনা ছাউনির চটজলদি খাবার। ভাতের মধ্যে সব্জি, ডিম, মাংস এবং মশলা দিয়ে মুখরোচক এবং খাদ্যগুণে ভরা দ্রুত খেয়ে নেওয়া যায় নির্ঝঞ্ঝাট একটি খাবার।"

এই বিরিয়ানিই কালক্রমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে জড়িয়ে নিয়েছে। তাতে বিরিয়ানির বৈচিত্র্য বেড়েছে। কলকাতার বিরিয়ানিকে বলা হয় 'কলকাতা বিরিয়ানি'। ঢাকার 'ঢাকাই বিরিয়ানি'। দুই দেশের দুই শহরেই জনপ্রিয় হায়দরাবাদের 'কাচ্চি বিরিয়ানি'। গুজরাতের কচ্ছের 'কচ্ছি বিরিয়ানি', মোরাদাবাদের 'মোরাদাবাদি বিরিয়ানি', সিন্ধু অঞ্চলের 'সিন্ধি বিরিয়ানি', পাকিস্তানের করাচির 'মেমনি বিরিয়ানি'-ও কলকাতায় পাওয়া যায়। তবে এখনো অভিজাত মুসলমানরা বিরিয়ানিকে 'নোংরা খাবার' মনে করেন। প্রয়াত লোকসভার সাংসদ সৈয়দ মাসুদাল হোসেনের কাছে শুনেছি, তাঁদের পূর্বপুরুষরা কেউ বিরিয়ানি খেতেন না। 'পুলাও' খেতেন। তিনি নিজে মনে করতেন, 'পুলাও'-র তুলনায় বিরিয়ানি খাদ্যটি অত্যন্ত নিম্নমানের। 'পুলাও' অর্থাৎ 'পোলাও', সংস্কৃতে যাকে বলে 'পলান্ন'। পল+অন্ন, 'পল' মানে 'মাংস'; মাংসযুক্ত ভাতকেই পলান্ন বলে। পোলাও নিরামিষ হয় না, কেননা কথাটার সঙ্গেই 'মাংস' লেগে আছে। তবুও 'নিরামিষ পোলাও' খাবারটি চালু আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পুজোয় ঠাকুরকে ভোগ হিসেবে আজকাল হিন্দু বাঙালিরা পোলাও দেন। তাঁরা নিরামিষ ভেবেই দেন, শুধু কোনো আমিষ উপকরণ থাকে না, এইমাত্র। সোনার পাথরবাটির মতো বাঙালির এই ভক্তি-রুচি বড়ই বিচিত্র।

29-8-18

লোকদেবী 'মা শীতলা'-কে ভোগ দেওয়া হচ্ছে রুই-কাতলার ঝোল, পূর্ব মেদিনীপুরের নাচিন্দার শীতলা মন্দিরে দেখেছি। আবার, তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে বছরভর কাঁচা আম দিয়ে শোল মাছের ঝোল দেওয়া হয়, যাকে 'আম-শোল' বলে। কলকাতার কালীঘাটের কালীমন্দিরে পাঁঠাবলি হয়। তবে এই পাঁঠার মাংসের রান্নায় পেঁয়াজ-রসুন পড়ে না। একে 'নিরামিষ পাঁঠার মাংসের ঝোল' বলে। অনেক বাঙালি হিন্দু বাড়িতে এখনো এই রান্নার চল আছে। হিন্দুদের কাছে দীর্ঘকালের অচ্ছুত হিং দিয়ে এই 'নিরামিষ পাঁঠা'-র ঝোল হয়। এছাড়া দুর্গাপুজো, কালীপুজোয় মাছ-মাংস দেওয়ার চল আছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেবতাকে রুচি অনুযায়ী ভোগ দেওয়া হয়। মনে করা হয়, ভক্তের রুচির সঙ্গে আরাধ্য দেবদেবীর খাদ্যরুচির-ই বা মিল থাকবে না কেন?

বাংলা ভাষায় একটি প্রবচন আছে, 'আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা'। দামু মুখোপাধ্যায় *খ্যাটন সঙ্গী* (৯ঋকাল বুকস, কলকাতা, ২০১৭) বইতে অঞ্চলভেদে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের খাদ্যরুচির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। একই সঙ্গে এ-বিষয়ে অন্যান্য লেখকদের লেখারও উল্লেখ করেছেন। লীলা মজুমদার (১৬-০২-১৯০৮ - ০৫-০৪-২০০৭)-এর কথা স্বভাবতই এসেছে। তিনি লিখেছেন, "তাঁর লেখায় পাওয়া যায় শিকারিদের হরিণের মাংস রান্নার কথা, বর্মার বাসিন্দাদের (এখনকার মায়ানমার) বাঁশের চোঙের ভিতর ভাপে সেদ্ধ মশলাদার ভাত রাঁধার গল্প। ছোট মাছ ও কুচো চিংড়ি পচড়চিয়ে তৈরি পদ ঙাপ্পি-র কথাও তিনি লিখে গিয়েছেন। আত্মজীবনী পাকদণ্ডী-তে প্রমদারঞ্জনের সেই দুর্ধর্ষ রসনা অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন লীলা। একবার জরিপের কাজে বর্মা মুলুকের কোনো এক জঙ্গলে প্রমদারঞ্জন ডেরা বেঁধেছেন। একদিন গ্রামের লোকেরা মাটি খুঁড়ে হাঁড়ি ভর্তি ঙাপ্পি তুলছে। দুর্গন্ধে টেকা দায়। প্রায় বমি উঠে আসে আর কি! গন্ধ-টন্ধ কনমে গেলে চান করে প্রমদারঞ্জন খেতে বসেছেন, ঠাকুর গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজছে। এমন সময় একদল লোক নিয়ে গ্রামের মোড়ল এসে হাজির। জোড় হাতে সে করুণ মিনতির সঙ্গে বলে, "ও সাহেব, তোমরা কী খাচ্ছ? আমরা যে গন্ধে টিকতে পারছি না...'। রুচির এমন পরস্পরবিরোধী উদাহরণ আর হয় না।

খুব শক্ত কাজ।" তারপর ক্রমে ক্রমে পৌরাণিক কাল থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত 'বাঙালি রান্না'-র বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে শেষ অধ্যায়ে তিনি লিখছেন, 'আজকের দিনের কলকাতাবাসী মধ্যবিত্ত তরুণ বাঙালিরা ভোজন ভজনায় লক্ষ্যণীয়ভাবে বঙ্গবিমুখ, কিংবা বলা যায় সর্বভারতীয় বা আন্তর্জাতিক; তাঁদের মধ্যে এমন আমি কাউকেই প্রায় চিনি না যিনি হৃষ্ট হন না দোসায়, বীফরোলে, হ্যাম্বার্গারে বা দহিবড়ায়। প্রায়ই তাঁরা বাইরে খেয়ে আসেন রাঁধাবাড়ার ঝামেলা বাঁচাবার জন্য, অথবা বাড়ি নিয়ে আসেন চৌ-মীন বা পঞ্জাবি দোকানের রুটি-মাংস। ...তবু এই কথাটুকু এখানে পেশ করতে চাই যে বাঙালি রান্না যদি আজ কালগ্রস্থ্ হয়ে থাকে— আর লক্ষণ দেখে তাই মনে হচ্ছে— তাহলে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকা জরুরি একটি প্রয়োজন— কেননা পরিবর্তন জীবনেরই একটি নিয়ম হলেও পরিবর্তনও পরিবর্তনের অধীনে, আর ইতিহাস ও পূর্বপুরুষের স্মৃতির মধ্যেই ভবিতব্যের বীজ নিহিত থাকে।' (পৃ. ২৪-২৫)। এই আক্ষেপ ও অপ্রতিরোধ্য প্রত্যাশার ভেতর দিয়ে বিবর্তিত হয়ে চলেছে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য-সংস্কৃতি, যা একান্তই সমাজ, 'ভূগোল-ইতিহাসে নির্ভরশীল'।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত (০১-০৮-১৮৬৮ - ১৪-১০-১৯৫৬) *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা* (মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলকাতা। গ্রন্থারমভ: ১৯ এপ্রিল ১৯২৯, গ্রন্থশেষ: ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৯। লিপিকার: প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রতিলিপিকার: কুমারী কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ: ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ: ৫ অক্টোবর ১৯৭৫)-য় লিখেছেন, 'এক প্রকার মুরুব্বী দেখা দিয়াছিল যাহাদিগকে ভোজপণ্ডে বলিত অর্থাৎ যাহাদের ভোজন পণ্ড করবার কাজ ছিল। তাহারা নিমন্ত্রিত হইয়া লোকেদের বাড়ি যাইয়া তাহাদের বংশের কোন কুৎসা রটনা করিয়া সমস্ত পণ্ড করিত। মুরুব্বী না খইয়া যাইলে অপরেও খাইত না। এই রকম দু-চারটি ব্যাপার হওয়ায় পাচক-ব্রাহ্মণের প্রথা উঠিল। তাহারা রন্ধন তেমন করিতে না পারিলেও ভোজপণ্ডেকে গালাগালি দিতে বিশেষ পটু ছিল। ভোজপণ্ডেরা দু-চার জায়গায় অপমানিত হওয়াতে তাহাদের প্রতাপ কমিয়া গেল, পরে লোপ পাইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গিন্নীদের হাতের সোনামুগের ডাল, শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট উঠিয়া গেল। কলিকাতায়

গিন্নীদের ভোজ-রন্ধন প্রথা উঠিয়া যাওয়ার এই একটি কারণ। পূর্ববঙ্গের মেয়েরা উৎকৃষ্ট রন্ধন করিতে পারে সেখানে পাচক-ব্রাহ্মণের প্রতাপ নাই। (পৃ. ১২)

এই পাচক-ব্রাহ্মণ আসলে ওড়িয়া রাঁধুনি ব্রাহ্মণ। তাঁরাই কালক্রমে কলকাতাবাসীদের রসনা তৃপ্তি করতে লাগলেন। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, ভাতের হোটেল ইত্যাদিতে তাঁরাই 'বামুন ঠাকুর'। কলকাতায় তাঁরা ভাতের হোটেলের ব্যবসাও শুরু করলেন, রমরমিয়ে চলতে লাগল। আজও চালু আছে। তার একটি অন্যতম শতবর্ষ পার করে দেওয়া 'স্বাধীন ভারত হিন্দু হোটেল'। ঠিকানা: ৮/২ ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, প্রেসিডেন্সি কলেজের পেছনের দিকে। আটানব্বই বছর বয়সী হোটেল-মালিক প্রহ্লাদচন্দ্র পণ্ডা তখনো জীবিত। চার-পাঁচ বছর বয়সে প্রতিষ্ঠাতা দাদা মনগোবিন্দ পণ্ডার সঙ্গে এসেছিলেন এই হোটেলে। দাদার কাছে শুনেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজ পড়াকালীন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিয়মিত খেতে আসতেন এই হোটেলে। হাঁক দিয়ে বলতেন, 'কী মনগোবিন্দ, আজ হয়েছে নাকি তোমার পুঁইশাকের চচ্চড়ি? তাড়াতাড়ি খেতে দাও।' বন্ধুবান্ধব নিয়ে নিজের হাতে শতরঞ্চি পেতে গোল হয়ে বসে পড়তেন সুভাষচন্দ্র বসু। এই হোটেল শুরু হয় ১৯১০-এ। রান্নার সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ধীরে ধীরে এই হোটেলই হয়ে উঠল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গোপন আখড়া। বহু রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে ওই হোটেলে। (তথ্যসূত্র: 'হোটেলের নাম স্বাধীন ভারত': অমর দেব রায়; আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ১৩ অগস্ট ২০১৭)।

বুদ্ধদেব বসুর *রন্ধনশিল্পী বাঙালি* বইতে একটি নিমন্ত্রণ বাড়ির রান্নার বিবরণ আছে, '...সবই বিশুদ্ধ নিরামিষ— যতদূর মনে পড়ে আলু গাজর টমেটোর মতো অর্বাচীন কোনো ফসলও ছিলো না— শুধু সনাতন শাকপাতা মশলা শস্যের রহস্যময় বহু বিচিত্র প্রকরণ, যার রন্ধনপ্রণালীর স্রষ্টাদের আমি প্রতিভাবান না বলে পারছি না'। (পৃ. ২৩)

এই 'অর্বাচীন' গাজর অবশ্যই আলু, টম্যাটোর মতোই বিদেশি খাদ্যবস্তু। 'বাংলা ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রবর্তক' বা 'উদ্ভট হাস্যরসের উদ্ভাবক' সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (২২-০৭-১৮৪৭ - ০৩-১১-১৯১৯) দেশে অনাহার আর দুর্ভিক্ষ থেকে প্রাণ বাঁচাতে

২৯-৪-১৪

গাজরের পুষ্টিগুণের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে গাজর চাষের অনুরোধ জানান, ১৮৭৮-এ। ১৮৮০-তে রায়বেরিলি ও সুলতানপুর জেলার দুর্ভিক্ষে তাঁর প্রস্তাবিত গাজর চাষের ফলে বহু মানুষের প্রাণ বাঁচে। (তথ্যসূত্র: সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, প্রথম খণ্ড; প্রধান সম্পাদক: সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সম্পাদক: অঞ্জলি বসু; সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ২৭৯)। অনেক দুর্ভিক্ষ, মহামারি, যুদ্ধ, দাঙ্গা, লোকাচার স্বাস্থ্যবিধি, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে বাঙালি খাদ্য-সংস্কৃতি তার নিজের পথ খুঁজে নিয়েছে। পথ খুঁজে নিয়েছে তার 'রুচির সমগ্রতা' দিয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজের দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনাসভায় এই কলেজেরই প্রাক্তনী গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনন-চর্চা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, অতি ধীরে, অতি যত্নে ক্রমাগত আদানপ্রদানে সে কাজ করতে হয়— তা 'স্লো কুকিং' বা ঢিমে আঁচে রান্নার মতো। (তথ্যসূত্র: আনন্দবাজা পত্রিকা, ১৭ জানুয়ারি ২০১৭) সে তো কেউ না কেউ করছেই।

'নরম ধানের গন্ধ— কলমীর ঘ্রাণ/হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের/ মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত— শীত হাতখান/ কিশোরের পায়ে দলা মুথাঘাস— লাল লাল বটের ফলের/ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা— এরি মাঝে বাংলার প্রাণ...' (রূপসী বাংলা: জীবনান্দ দাশ। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবী, কলকাতা, ২০১০. পৃ. ৪০) — এই 'বাঙালির প্রাণ'-এর নিজস্ব সজীবতা একাত্ম হয়ে আছে ভারতীয় আত্মার ভেতর—

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।

29-8-18

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

(গীতাঞ্জলি, ১০৬ নং কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ, কলকাতা, মে ১৯৮২, পৃ. ২৫৫)

29-08-2018